বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

ছোটদের বিজ্ঞান পত্রিকা

বৈশাখ-চৈত্র ১৪২২
১৪ই এপ্রিল, ২০১৬
অষ্টবিংশতি বর্ষ : প্রথম থেকে চতুর্থ সংখ্যা

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ
ঢাকা

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ঢাকা

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা
ছোটদের বিজ্ঞান পত্রিকা
বৈশাখ-চৈত্র, ১৪২২
১৪ই এপ্রিল, ২০১৬
অষ্টবিংশতি বর্ষ : প্রথম থেকে চতুর্থ সংখ্যা

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, বিসিএসআইআর, ঢাকা

সম্পাদনা পরিষদ
আহ্বায়ক
মোঃ মনছুর রাজা চৌধুরী
সদস্য
ড. খন্দকার নেছার আহ্‌মেদ
ড. সামিনা আহ্‌মেদ
মুহাম্মদ শাহরিয়ার বাসার
লিটন চন্দ্র মহন্ত

সম্পাদক
মোঃ ইছাহাক মোল্লা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়
মোঃ ইছাহাক মোল্লা

মুদ্রণে
জলসিঁড়ি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৬২ ফকিরাপুর, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবা: ০১৭১৫৩০৫৩৭১

মূল্য: দশ টাকা

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

ছোটদের বিজ্ঞান পত্রিকা

১। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হয়।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য দশ টাকা, বার্ষিক মূল্য চল্লিশ টাকা। টাকা মানি অর্ডারযোগে পাঠাতে হয় ডাক খরচসহ।

৩। রেজিস্ট্রি বা বিমান ডাকযোগে পত্রিকা পেতে হলে সেই খরচ গ্রাহককেই বহন করতে হবে।

৪। এজেন্টদের জন্য কমিশন শতকরা ত্রিশ টাকা । ১০ কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয় না।

লেখক-লেখিকাদের জন্য:

১। "বিজ্ঞানের জয়যাত্রা"-এর জন্য বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়, যাতে করে ছেলেমেয়েরা সহজেই আকৃষ্ট হয়।

২। প্রবন্ধের সাথে চিত্র থাকলে তা পৃথক সাদা কাগজে এঁকে পাঠাতে হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে অথবা কম্পিউটার কম্পোজে লেখা না হলে প্রবন্ধ প্রকাশিত না হওয়ারই সম্ভাবনা রয়েছে।

৩। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখক-সম্মানীর ব্যবস্থা রয়েছে।

৪। প্রবন্ধের শিরোনামের ডান কোণায় "শুধু বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় ছাপানোর জন্য" এই কথা স্পষ্ট করে লেখা থাকতে হবে।

৫। কোন লেখা পত্রিকায় ছাপানোর অবিবেচিত হলে তা ফেরত দেওয়া হয় না।

প্রবন্ধে লিখিত মতামত ও তথ্য সম্পূর্ণই প্রবন্ধকারের। এ সম্পর্কিত বিষয়ে সম্পাদক দায়ী নয়।

যোগাযোগ

মোঃ ইছাহাক মোল্লা

সম্পাদক

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

ডঃ কুদরাত-এ-খুদা সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ। ফোন : ৯৬১৫৭৪২

E-mail : ishakpro@yahoo.com, web : www.bcsir.gov.bd

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

সূচীপত্র

১।	নক্ষত্রের জীবন	: অধ্যাপক ড. আলী আসগর	৫
২।	রিফাইন্ড তেল কতটা নিরাপদ	: অধ্যাপক ড. নিশীথ কুমার পাল	১০
৩।	ফসল ও মানুষ	: অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া	১৫
৪।	জ্ঞানভিত্তিক সমাজ চাই	: মোস্তাফা জব্বার	২৩
৫।	বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানীঃ জামাল নজরুল ইসলাম	: শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী	৪৭
৬।	পৃথিবীর বিকর্ষণ বল ও বস্তুর নিম্নমুখী পতনের কারণ	: ডাঃ মোঃ আক্কাস উদ্দীন	৫৬
৭।	বিদ্যুতের উৎস হিসেবে হৃদস্পন্দন ও দেহের চাপের ভূমিকা	: এম এ ওহাব	৬৩
৮।	তরুণ প্রজন্ম : আত্মনির্ভরশীলতার নতুন সম্ভাবনা	: মোঃ নজরুল ইসলাম	৬৭
৯।	এইচআইভি প্রতিরোধক বড়ি	: অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৬
১০।	টেস্টটিউব মাংস	: শাহনাজ বেগম	৭৯
১১।	ছোটদের স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু	: লিটন চন্দ্র মহন্ত	৮১
১২।	মোবাইল বা সেলুলার ফোনের তেজস্ক্রিয়তা ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা	: শেখ মোঃ নূরুল ইসলাম	৮৭
১৩।	পরিবেশ বিপর্যয়	: মোঃ ইছাহাক মোল্লা	৯০
১৪।	চেনা অচেনা ভেষজ ফল	: সোফিয়া হোসেন	৯৯
১৫।	বর্ণ ভেদে আলোর গতি আপেক্ষিক	: মাহিরুর রহমান	১১৭
১৬।	বৈশ্বিক উষ্ণায়ন জলবায়ু পরিবর্তন কৃষি সংকটাপন্ন ও খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত	: জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবুর	১১৯

নক্ষত্রের জীবন

অধ্যাপক ড. আলী আসগর

মহাবিশ্বে নক্ষত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। নক্ষত্র শক্তির উৎস এবং অধিকাংশ মৌলিক পদার্থের উদ্ভব স্থল। উদ্ভব, বিকাশ ও অবক্ষয়ের চঞ্চল গতিশীল ধারায় নক্ষত্রের জীবন অত্যন্ত নাটকীয়। গাণিতিক কুশলতা, পর্যবেক্ষণের দক্ষতা, তত্ত্ব নির্মাণের উদ্ভাবনী শক্তি, অনুমান ও সংজ্ঞা-সব কিছু মিলে নক্ষত্র সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের উপলব্ধি বিপুল সাফল্য লাভ করেছে সম্প্রতি। নক্ষত্র এমন এক রঙ্গমঞ্চ যেখানে প্রকৃতির নানা বলই শুধু আত্মপ্রকাশ ঘটাচ্ছে না, জ্ঞানের নানা শাখা সমন্বিত হয়েছে এখানে। অতি বিশাল ও অতি ক্ষুদ্রকে জানার যে পদ্ধতিগত ভিন্নতা তা জ্ঞানের জগৎকে বিচ্ছিন্ন করার কথা, কিন্তু নক্ষত্র সম্পর্কে গবেষণা জ্ঞানের জগৎকে একীভূত করেছে। বিভিন্ন শাখার জ্ঞান এখানে পরস্পরের পরিপূরক রূপে কাজ করছে। মৌল কণিকার ও অণু পরমাণুর উদ্ভব সম্পর্কে আমরা যেমন-জানতে পারি নক্ষত্রের বিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করে, মৌল কণিকা ও মৌলিক বলগুলো সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞানও তেমনি নক্ষত্রের গঠন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের আলোকপাত করেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান, সৃষ্টিতত্ত্ব, কোয়ান্টাম তত্ত্ব, গণিত, রসায়ন এমন কি জীববিজ্ঞান, পারস্পরিক প্রভাব ও পরিপূরকতায় বিশ্বজগতের রহস্য উদঘাটনে যে বিস্ময়কর সাফল্য দিয়েছে বিংশ শতাব্দীতে, নক্ষত্রের জীবন অর্থাৎ এর বিকাশের পর্যায় নিয়ে গবেষণা সেখানে ভিত্তিরূপে কাজ করেছে। নক্ষত্র কেমন করে সৃষ্টি হয়, এর প্রচন্ড তাপ ও শক্তি কোথা থেকে আসে?

এর বিবর্তন কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়? বিভিন্ন আকারের নক্ষত্রের পরিণতি কতটা ভিন্ন এবং কেন ভিন্ন হয়? মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে নক্ষত্রসমূহের ভূমিকা কি? এ প্রশ্নগুলোর জবাব আমরা সন্ধান করব সাম্প্রতিক পদার্থ বিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে।

নক্ষত্রের উদ্ভব

একটি নক্ষত্রের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়গুলোর মধ্যে এর জন্মের দিকটি সবচেয়ে কম উদঘাটিত। আমরা এখন যে সব নক্ষত্র অসংখ্য হয়ে ছড়িয়ে থাকতে দেখি বিভিন্ন গ্যালাক্সিতে, সেখানে তাঁরা পরিবৃত হয়ে আছে গ্যাস এবং ধূলিকণার মেঘের মধ্যে। স্বভাবতই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, যে সব বস্তুকণিকা এই মেঘ সৃষ্টি করে আছে সেখান থেকেই নক্ষত্রের জন্ম। জলীয় বাষ্প থেকে কেমন করে জলকণার সৃষ্টি হয় তা আমরা জানি। জলীয় বাষ্প জমাট বেঁধে জলবিন্দুর উদ্ভব ঘটায়। কিন্তু পানির ফোঁটা যেমন তড়িৎ বলের কারণে রাসায়নিক অনুবন্ধন সৃষ্টি করে পানির অণুগুলোকে একত্রিত করে ও ধরে রাখে, নক্ষত্রের খেলার বস্তু সমাবেশ ঠিক সেভাবে ঘটে না। এখানে কাজ করে মহাকর্ষ বল, যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি দুর্বল হলেও বহুদূর বিস্তৃত এর প্রভাব বলয়। বৃষ্টির ফোঁটার তুলনায় ১০-১৮ গুণ। আন্তঃনক্ষত্রের এলাকাতে যে গ্যাস ছড়িয়ে আছে তা মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত বেশি ঘন এলাকা সৃষ্টি করলে সেখানে মহাকর্ষ বল গ্যাসগুলোকে পরস্পরের কাছে টানতে থাকে। এই এলাকাগুলো যত ঘনীভূত হয়, মহাকর্ষ বলের তীব্রতা সেখানে তত বৃদ্ধি পায়।

যে গ্যাসের মেঘ থেকে নক্ষত্রের জন্ম সেখানে এত বিপুল পরিমাণ বস্তু থাকে যে, এক একটি মেঘ থেকে কয়েক সহস্র নক্ষত্র সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু কেমন করে গ্যাসের পিণ্ডগুলো পৃথক হয়ে বিভিন্ন আকারের নক্ষেত্রের ভিত্তি সৃষ্টি করে তা নিয়ে নানা তত্ত্ব থাকলেও সর্বস্বীকৃত কোন তত্ত্ব নেই। যদি আমরা গ্যাসপিণ্ড সৃষ্টি হবার ব্যাপারটি ধরে নেই, তা হলে মহাকর্ষের প্রভাবে এর ঘনীভবন ও নক্ষত্র সৃষ্টি বুঝতে বিশেষ অসুবিধা নেই। কোন নক্ষত্রের ক্রমাগত সংকোচনকে প্রতিহত করার জন্য নক্ষত্রের মধ্যে বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি হয়। এই চাপ নিয়ন্ত্রণ করে গ্যাস অণুগুলোর তাপমাত্রা ও ঘনত্ব। এটি হল

নক্ষত্রের পূর্বাবস্থা। এই অবস্থায় বহির্মূখী চাপ সবচেয়ে বেশি থাকে কেন্দ্রে এবং বাইরের দিকে ক্রমাগত কমতে থাকে। প্রতিটি নক্ষত্রের বেলায় এর মহাকর্ষজনিত অন্তর্মুখী চাপের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এই দুই বলের প্রতিযোগিতাই শেষ পর্যন্ত একটি নক্ষত্রের সমগ্র জীবন ও এর গঠন নির্ধারণ করে। একটি নক্ষত্রের ক্রমাগত সংকোচন প্রতিহত হয় নক্ষত্রের ভিতরে এর বহির্মুখী চাপ দ্বারা, কিন্তু সেটি ঘটে যখন নক্ষত্রটি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এই তাপ সৃষ্টির শক্তি উৎপন্ন হয় মহাকর্ষ বলের সম্পাদিত কাজ ছাড়া। নক্ষত্রের ব্যাস যত ছোট হতে থাকে এর অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা তত বেশি হয়। কিন্তু নক্ষত্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এর পৃষ্ঠদেশ থেকে শক্তি বিকীর্ণ হতে থাকে। নক্ষত্র শক্তি বিকিরণের ফলে কিছুটা ঠাণ্ডা হলে সঙ্কোচন বৃদ্ধি পায়। আমাদের পরিচিত বস্তুমালা থেকে নক্ষত্রের আচরণ তাই ভিন্ন। এ যত শক্তি হারায় এর তাপমাত্রা তত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

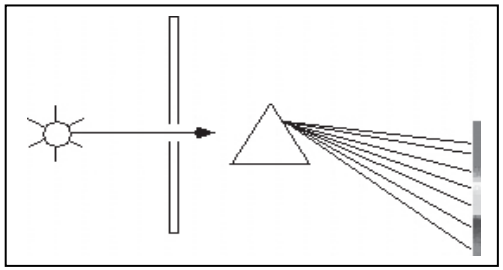

নিউক্লিয় বিক্রিয়ার সূচনা

মহাকর্ষ বলের প্রভাবে যদি আদি নক্ষত্র প্রায় দশ লক্ষ বছর ধরে অব্যাহত ভাবে সংকোচিত হবার ভিতর দিয়ে এর অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা যখন প্রায় এক কোটি ডিগ্রী কেলভিনে পৌঁছে, তখন এতে প্রোটন ও কিছু ইলেকট্রন থাকে। একটি নিউট্রন নক্ষত্রের ব্যাসার্ধ মাত্র কয়েক কিলোমিটার, যদিও এর ভর সূর্যের ভরের প্রায় দ্বিগুণ (পৃথিবীর তুলনায় দশ লক্ষ গুণ)। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত নিউট্রন নক্ষত্র শুধু তাত্ত্বিক ধারণা রূপেই পরিচিতি লাভ করে। সেই বছরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানথনি ছিভারিশ এবং তাঁর ছাত্র জোসেলিন বেল পালসার আবিষ্কার করেন। তাঁরা আবিষ্কার করেন যে আকাশের বিশেষ দিক

থেকে পর্যায়ক্রমিক ভাবে রেডিও তরঙ্গের স্পন্দন আসছে। প্রথম তাঁরা অনুমাণ করলেন যে এই সঙ্কেত আসছে আমাদের গ্যালাক্সির কোন বুদ্ধিমান প্রাণী মারফত। কিন্তু দ্রুত সেই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিতে হল। এই স্পন্দনগুলোর আসল উৎস পরে উদঘাটিত হল ঘূর্ণায়মান চুম্বকিত নিউট্রন নক্ষত্ররূপে। মহাবিশ্বে অন্য এক সভ্যতার সন্ধান মেলার মতন রোমাঞ্চকর না হলেও এই আবিষ্কারটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পালসার সম্পর্কে কোন পূর্বাভাস আগে ছিল না, যদিও এটি আবিস্কৃত হবার অন্তত তিরিশ বছর আগে থেকে নিউট্রন নক্ষত্র নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণা চলছিল। পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতির্বিজ্ঞানে, এটি তার একটি দৃষ্টান্ত। পালসার আবিস্কৃত হবার পর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পালসার নিয়ে তাত্ত্বিক মডেল নির্মাণ করলেন, যেখানে তার চুম্বকক্ষেত্র সম্পন্ন নিউট্রন নক্ষত্রকে কল্পনা করা হল।

নক্ষত্রে চুম্বক ক্ষেত্র থাকা নতুন কিছু নয়, আমাদের সূর্যেও চুম্বক ক্ষেত্র রয়েছে, কিন্তু নিউট্রন নক্ষত্রের চুম্বক-ক্ষেত্র সে তুলনায় এক লক্ষ কোটি ($১০^{১২}$) গুণ বেশি। এটি অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ নক্ষত্র সঙ্কুচিত হবার সময় এর চৌম্বক ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায় এবং একটি নিউট্রন নক্ষত্র স্বাভাবিক হবার সময় এর চৌম্বক ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায় এবং একটি নিউট্রন নক্ষত্র একটি স্বাভাবিক নক্ষত্রের তুলনায় লক্ষ ভাগ ছোট। কোন নক্ষত্র সঙ্কুচিত হবার সময় এর ঘূর্ণন গতিও বৃদ্ধি পায়, ঘূর্ণন ভরবেগের অবিনশ্বরতার নীতি অনুসারে। ফলে, নিউট্রন নক্ষত্রও দ্রুত পাক খাবার কথা। নিউট্রন নক্ষত্রের ঘূর্ণন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে পর্যবেক্ষণলব্ধ পালসারের বিকিরণ ব্যাখ্যায়। এই ঘূর্ণনশীল নিউট্রন নক্ষত্র একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, যা এই নক্ষত্রের আশপাশ থেকে চার্জযুক্ত কণিকাকে তরান্বিত করে। এই কণিকাগুলো আবার তার তাড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ বিকিরণ করতে থাকে, যখন এদের গতি আলোর গতির কাছাকাছি চলে যায়। পালসারের নিজস্ব ঘূর্ণন গতির সঙ্গে এর চৌম্বকক্ষেত্র ঘুরতে থাকে এবং তার কণিকাগুলোর গতি নিয়ন্ত্রণ করে। এরফলে "সার্চলাইট রশ্মি সৃষ্টি হয় যা আমরা দেখতে পাই। এই মডেলটি চমৎকার সমর্থন লাভ করে ১৯৬৯ সালে। যখন দেখা গেল যে কর্কটরশ্মির একটি সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষের

কেন্দ্রে অবস্থিত একটি পালসার তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ বিকিরণ করছে যা সেকেন্ডে তিরিশ বার স্পন্দন সৃষ্টি করে। এই পর্যায়কাল আমাদের দৃষ্টি থেকে কালের চেয়ে ছোট বলে আমাদের চোখে এর বিকিরণ অপরিবর্তী মনে হয়। বিশেষ ইলেকট্রনিক গ্রাহকযন্ত্রে আলোর উজ্জ্বলতার এই স্পন্দন ধরা পড়ে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এটাও দেখেছেন যে এই নিউট্রন নক্ষত্রটি ক্রমাগত শক্তি হারায় যা অন্যান্য পালসারের জন্যেও প্রযোজ্য। বিকিরণের মাধ্যমে পালসারের শক্তি হারাবার পরিমাণ সুপারনোভার অবশেষ থেকে পাওয়া বিকিরণের পরিমাণের সঙ্গে হিসাবে মিলে যায়। পালসারের মডেলের সমর্থন হিসাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই তথ্যকে স্বভাবতই ব্যবহার করছেন। একটি পালসারকে আমরা সবচেয়ে দক্ষ কণিকা ত্বরক বা Particle accelerator ভাবতে পারি, যা এর ঘূর্ণন শক্তিকে উচ্চ শক্তির কণিকা সৃষ্টিতে ব্যবহার করছে প্রায় শতকরা একশ ভাগ দক্ষতা নিয়ে। সব নিউট্রন নক্ষত্রই পর্যবেক্ষণযোগ্য স্পন্দন সৃষ্টি করতে পারে না। এবং সুপারনোভাই যে নিউট্রন নক্ষত্র রেখে যাবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু আমরা বলতে পারি আমাদের গ্যালাক্সিতেই লক্ষ লক্ষ নিউট্রন নক্ষত্র রয়েছে।

অধ্যাপক ড. আলী আসগর
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, (বুয়েট)
ঢাকা-১০০০।

রিফাইন্ড তেল কতটা নিরাপদ

অধ্যাপক ড. নিশীথ কুমার পাল

বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও প্রচারনায় দাবি করা হয় রিফাইন্ড তেল নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত। প্রকৃতপক্ষে কি তাই? এ বিষয়ে আলোচনার আগে দ্রুত দেখে নেয়া যাক, ভোজ্য তেল কোম্পানিগুলো কেন এবং কিভাবে তেল রিফাইন্ড বা পরিশোধন করে।

প্রথম যে প্রশ্নটি মনে উদয় হয়, তা হলো কেন তেল রিফাইন্ড করা হয়? ইন্ডাস্ট্রিজের দিক থেকে বিবেচনা করলে সকল প্রকার অবাঞ্ছিত বস্তু দূর করার জন্য তেল রিফাইন্ড করা হয়। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, অবাঞ্ছিত বস্তু সম্পর্কে আমাদের ধারণা ও তেল কোম্পানির টেকনিশিয়ানদের ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল দিক থেকে তেলে এমন কোনো বস্তুর উপস্থিতি থাকলে, যা এর রঙ্গকে গাঢ় করে, অনন্য কোনো গন্ধ অথবা কোনো স্বাদ সৃষ্টি করে, এদেরকে বলে অবাঞ্ছিত বস্তু। তেলকে 'খাঁটি' করার জন্য এগুলোকে অপসারণ করা হয়। দুঃখের বিষয়, যে সব বস্তু তাদের কাছে অবাঞ্ছিত, তাই আবার আমাদের জন্য বাঞ্ছিত বস্তু। কেননা এগুলি হলো ভিটামিন এ,ই, অত্যাবশ্যক ফসফোলিপিড ইত্যাদির মতো পুষ্টি উপাদানের উৎস। তাই তেলকে তথাকথিত 'খাঁটি' করতে গিয়ে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে গমের আটা ও চিনিকে রিফাইন করার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। এখানেও প্রাকৃতিক ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, এনজাইম ইত্যাদিকে সরিয়ে ফেলে প্রাকৃতিক খাদ্যকে ডিভাইটালাইজড খাদ্যে পরিণত করা হয়।

প্রক্রিয়াজাত তেল সাধারণত তাপ প্রয়োগে নিষ্কাশন করা হয়, তারপর ডিগামড করা হয়। শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় লেসিথিনের মতো ফসফোলিপিড এবং লোহা, তামা, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের মতো খনিজ মৌল অপসারণ করা হয়। এই তেলে সাধারণত নিকেলের উপস্থিতিতে হাইক্রোজেন যুক্ত করা হয় (হাইড্রোজিনেশন)। কিছুদিন আগেও প্রচুর পরিমাণে নিকেল ব্যবহার করা হতো এবং এর কিছু অংশ তেলে থেকে যেতো। তবে নিকেলের বিষাক্ত ধর্মাবলীর কথা বিবেচনা করে কোনো কোনো দেশের সরকার নিকেল ব্যবহারের একটি ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তথাপিও কিছু পরিমাণ নিকেল ব্যবহার করা হচ্ছে এবং বেশি পরিমাণে তেল খাওয়ার জন্য এগুলো শরীরে জমা হচ্ছে। রিফাইন্ড চিনি ও সাদা ময়দা তৈরির মতো, 'সাদা' তেল তৈরির সর্বশেষ ধাপ হলো বিচিং। তেল বিচ করতে, মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড অপসারণের জন্য সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করা হয়। এর সাথে অবশ্য বিটা ক্যারোটিন ও উদ্বায়ী তেলও (এর জন্য প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ তেলের সুগন্ধ হয়) অপসারিত হয়। তেলের প্রক্রিয়াকরণ ও ফ্যাটি অ্যাসিডে হাইক্রোজেন যুক্তকরণের জন্য তেল মিউটাজেনেক অর্থাৎ মিউটেশন সৃষ্টি করতে পারে (ডিএনএ-এর পরিবর্তন ঘটায়)। ভাল ও খারাপ ফ্যাটসহ তেল চার রকমের ফ্যাট আছে। এগুলো হলো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট (MUFA) পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, স্যাচুরেটেড বা সম্পৃক্ত ফ্যাট এবং ট্রান্স ফ্যাট। তেলে এগুলি বিভিন্ন পরিমাণে থাকে। মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট হলো ভাল ফ্যাট। কারণএগুলি কোলেস্টেলের মাত্রা কমায় এবং হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাস করে। সাধারণভাবে বলা হয় যে, স্যাচুরেটেড বা সম্পৃক্ত ফ্যাট খাওয়া কমাতে হবে, বিশেষ কর বয়স্কদের ক্ষেত্রে।

সবচেয়ে খারাপ প্রকারের ফ্যাট হলো ট্রান্সফ্যাট, ফ্যাটি থ্যাসিডস, স্যাচুরেটেড ফ্যাট থেকেও অনেকখানি খারাপ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত পুষ্টিবিদরা মন্তব্য করেছেন যে, প্রতি বছর ত্রিশ হাজারেরও বেশি মানুষের অকাল মৃত্যু হয় করোনারি হৃদরোগে। ট্রান্স ফ্যাট রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে এবং ধমনিতে জমা হতে থাকে। অপর একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি হলো

আংশিক হাইড্রোজিশান বা হাইড্রোজেন যুক্তকরণ। এর জন্য ট্রান্স ফ্যাট তৈরি হওয়ায় খুবই ভাল তেল খুব খারাপ তেলে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় তেল অধিকতর শক্ত হয়, বেক করা খাদ্যবস্তু বেশিদিন ভাল থাকে এবং এই তেল ভাজার কাজে ভালভাবে ব্যবহার করা যায়।

এ রকম অধিকাংশ মনুষ্যসৃষ্ট ট্রান্স ফ্যাট আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। আমাদের শরীর থেকে ট্রান্সফ্যাট বেরিয়ে না গিয়ে কাশের ঝিল্লীতে সিস ফ্যাটের মতো জমা হয়। এ সকল ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড কোষের বিপাকে ভীষণভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কারণ হইড্রোজিনেশান প্রক্রিয়ার জন্য বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার কোষ ঝিলীর ইলেকট্রন সুনির্দিষ্ট প্যাটার্নে না থাকায়, রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে পারে না। একই তেলে খাদ্যবস্তু ডিপ ফ্রাই করার ভোজ্য জন্যও ট্রান্স ফ্যাট তৈরি হয়, তবে এ ব্যাপারে বিতর্ক আছে। খাদ্যবস্তু ভাজার সময় তেলের স্মোকিং পয়েন্ট বা ধোঁয়া সৃষ্টিকারী বিন্দু নোট করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি এমন একটি বিন্দু যখন তেল থেকে ধোঁয়া বের হওয়া শুরু হয়। যেসব তেলের স্মোকিং পয়েন্ট বেশি, সেগুলি ভাজার কাজে ব্যবহার করলে আমাদের জন্য ভাল। একই তেল বার বার ভাজার কাজে ব্যবহার করার জন্য এর স্মোকিং পয়েন্ট কমে যায়, তাই ক্ষতিকর হয়।

বুদ্ধিমত্তার সাথে তেলের ব্যবহার

আমাদের খাদ্যে সীমিত পরিমাণে ফ্যাট থাকা উচিত, তবে তা হওয়া উচিত উন্নতমানের। আমাদের খাদ্যে রিফাইনড তেলের পরিবর্তে ভাল মানের ফ্যাট থাকা উচিত। আর এসব ফ্যাট পাওয়া যায় সামুদ্রিক মাছ, যেমন ম্যাকেরল, সারডিন, টুনা ইত্যাদি এবং কড ফিসে।

লিভার অয়েল ওমেগা-৩ সাপ্লিমেন্ট থেকে অ্যাভোকাডোস, বিভিন্ন নাটস বিশেষ করে ওয়ালনাটস ও ব্রাজিল নাটস এবং বীজ (তিসি, পামকিন ইত্যাদি) থেকে অনেকদিন থেকেই এমন রান্নার তেলের অনুসন্ধান করা হচ্ছে, যা হবে স্বাস্থ্যসম্মত, স্থায়ী, সহজে নষ্ট হয় না এবং একই সাথে দামও কম । আমাদের দেশে দৈনন্দিন ব্যবহার করা হয় এমন কতকগুলি তেল নিয়ে আলোচনা করা যাক। রান্নার তেল হিসেবে রাই সরিষার তেল যথেষ্ঠ ভাল,

বিশেষ করে হৃদরোগীদের জন্য। কারণ খুবই ভালো অনুপাতে ওমেগা ৩ এবং ওমেগা ৬ ফ্যাটি অ্যাসিড এতে যা আছে, তা কদাচিত অন্য তেলে পাওয়া যায়। তাছাড়া, রাই সরিষার তেল নিম্ন চাপে ও নিম্ন তাপে (৪০-৬০ সেলসিয়াস) নিষ্কাশন করা হয়। এতে ০.৩০-০.৩৫% উদ্বায়ী তেল (অ্যালাইল আইসোথঅয়োসায়ানেট) আছে, যা প্রিজারভেটিভ হিসেবে কাজ করে।

রাই-সরিষার তেলে বেশি পরিমাণে ইরুসিক অ্যাসিড থাকায়, আগে মনে করা হতো, যে, এটি হার্ট ও পেটের গন্ডগোল সৃষ্টি করে। তবে বর্তমারে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এই তথ্য ঠিক নয়। আরও জানা গেছে যে, রাই-সরিষার তেলে রান্না করা খাদ্য ও সবুজ পাতার শাকসবজি খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে যায়। কোনো কোনো এলাকায় নারকেল তেল রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। নারকেল তেলে ৯০% পর্যন্ত সম্পৃক্ত ফ্যাট, ৬% মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ২% পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট আছে। তবে অন্যান্য খুবই সম্পৃক্ত ফ্যাটের মতো নয়, মধ্যম শৃঙ্খল ফ্যাটি অ্যাসিড দ্বারা নারকেল তেল গঠিত। এই মধ্যম শৃঙ্খল ফ্যাটি অ্যাসিড সহজে হজম হয় ও শরীরের পরিশোষিত হয়, অন্যান্য ফ্যাটের তুলনায়। উচ্চ মাত্রায় সম্পৃক্ত ফ্যাটের জন্য সুস্থিরতার কারণে, বেশ ধীরে ধীরে এর জারণ হয়। তাই সহজে পচে যায় না এবং দু'বছর পর্যন্ত ভাল থাকে। তাছাড়াও নারকেল তেল খুব তাপ প্রতিরোধ, তাই উচ্চ তাপে ভাজার কাজে এটি উপযোগী।

নানা শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও, রিফাইন্ড তেল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় প্রায়ই সূর্যমুখী তেল ব্যবহার করা হয়। এর উচ্চ স্মোকিং পয়েন্ট (প্রায় ৪৬০ ফারেনহাইট) আছে, তাই ডিপ ফ্রাইয়ের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে উচ্চ মাত্রায় PUFA (68%) এবং MUFA (21%) কিন্তু নিম্ন মাত্রায় সম্পৃক্ত ফ্যাট (১১%) আছে। একইভাবে ক্যানোলা তেল রান্নার একটি খুবই ভাল মাধ্যম, কারণ এতে খুব কম সম্পৃক্ত ফ্যাট (মাত্র ৭% বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ভোজ্য তেলের মধ্যে সবচেয়ে কম) এবং উচ্চ মাত্রায় মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট ও সেইসাথে উপকারি ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড আছে। তাই এর হার্ট সুরক্ষাকারী ধর্মাবলীর জন্য এটি আদর্শ রান্নার মাধ্যম। ক্যানোলা তেলের মৃদু সুগন্ধ আছে এবং এমন কি উচ্চ তাপেও

সুস্থির থাকে। রাইস ব্র্যান তেলেরও কিছু উপকারি ভূমিকা আছে। এতে এমন একটি উপাদান আছে, যাকে বলে ওরাইজানল। এর কোলেস্টেরল হ্রাসকারী ধর্মাবলী আছে। মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড ও প্রাকৃতিক ভিটামিন ই সমৃদ্ধ হওয়ায় রান্নার তেল হিসেবে এটি যথেস্ট ভাল এবং উচ্চ তাপে রান্নার কাজেও এটি ব্যবহার করা যায়।

তেল দিয়ে রান্না করবেন কি করবেন না

যে সমস্ত তেলে উচ্চ তাপ প্রয়োগ করা হয়েছে, 'পরিশুদ্ধ' করতে হেক্সেনস এর মতো বিপজ্জনক দ্রাবক ব্যবহার করা হয়েছে এবং অস্বাস্থ্যকর প্রিজারভেটিভ যোগ করা হয়েছে, যেসব তেল পরিহার করা উচিত। কেননা এগুলো ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। এর পরিবর্তে দেখতে তেমন সুন্দর নয় ও রিফাইন না করা তেল ও ফ্যাট, যেগুলো প্রথাগতভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সেগুলোই খাওয়া উচিত। এর জন্য আমরা সুস্থ থাকবো। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, বিভিন্ন রান্নার জন্য বিভিন্ন প্রকারের তেল ব্যবহার করা উচিত। যেমন সালাদের জন্য অলিভ অয়েল বা জলপাই তেল, উচ্চ তাপে রান্নার জন্য সূর্যমুখী কিংবা ক্যানোলা তেল এবং অন্যান্য কাজে রাই সরিষার তেল। চিকিৎসকেরা সুপারিশ করেন যে, মাঝে মাঝে রান্নার তেল বদলানো উচিত। কেননা এতে করে কোনো একটি নির্দিষ্ট তেলে উপস্থিত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ আমাদের দেহে বেশি পরিমাণে জমবে না। আবার কোনো একটি পুষ্টি উপাদান সেই তেলে না থাকলে, অন্য তেল থেকে তা পাওয়া যাবে। পরিশেষে বলা যায়, এটি সবচেয়ে ভাল হয় যদি দৃশ্যমান ফ্যাটের ব্যবহার আমরা কমিয়ে ফেলতে পারি (প্রতিদিন দুই টেবিল চামচের কাছাকাছি) এবং যতটা সম্ভব রিফাইনড তেলের পরিবর্তে পুষ্টিকর রিফাইন না করা তেল ব্যবহার করতে হবে। তাই নব্য ঘিয়ে ভাজা পরোটা হয়তো এত খারাপ নয়, যদি আমরা মাঝে মধ্যে খাই।

ড. নিশীথ কুমার পাল
অধ্যাপক
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।

ফসল ও মানুষ

অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

খাদ্য সংগ্রহ করার কাজটি মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসের একটি বড় কাজ ছিল। মানুষ ছিল একেবারেই প্রকৃতি নির্ভর। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত না হতে পারাটা মানুষের জন্য ছিল এক অনিশ্চিত জীবন যাপন। বুনো গাছগাছালি আর বুনো ফসল নিয়ে যাচাই বাছাই করতে করতে মানুষ পেল তার ফসল। অতঃপর ফসলের আবাদ শুরু করলো মানুষ। শুরু করলো পশু পালন ও পাশাপাশি এর মধ্য দিয়ে সত্যি সত্যি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হলো মানুষ। কৃষির উপর নির্ভর করে মানুষ যেন এক নতুন পথের ঠিকানা খুঁজে পেল। স্থায়ী বসবাস গড়ে তুললো সে। কৃষিজীবী মানুষ এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুললো। দিনে দিনে তার আবাদের আওতায় যুক্ত হলো নতুন নতুন ফসল। ধীরে ধীরে বাড়লো কিছুটা তার পোষমানা পশু প্রজাতির সংখ্যাও।

নানা রকম হাতিয়ার আবিষ্কার মানুষের কৃষি ব্যবস্থাটাকে খানিকটা সহজতর করে তুললো। মাটি চষা, ফসলের কিছু পরিচর্যা করা, ফসল কর্তন আর মাড়াই ঝাড়াই করার মতো ছোট ছোট হাতিয়ার তো আগে থেকেই ছিল। ছিল অন্য পশুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষের নানা রকম হাতিয়ার। আগুনের আবিষ্কারের পর যুক্ত হলো ধাতব হাতিয়ার। এর মাধ্যমে কৃষি কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পেল। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার নানা উপায়ও তাতে উদ্ভাবন করা সম্ভব হলো। দিনে দিনে মানুষ চাকা আবিষ্কার করতে পারলো। সে চাকা মানুষের গতিটাই অনেক পাল্টে দিল।

প্রাকৃতিক পরিবেশের স্থলে কৃষিজ পরিবেশের প্রাধান্য দিনে দিনে বেড়ে গেল। বন জঙ্গল পরিষ্কার করে মানুষের কৃষিজ পরিবেশের যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে মানুষ তা থেকে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবার আর কোন সুযোগ থাকলো না। কৃষি মানব ইতিহাসের গতিধারা পাল্টে দিল। কৃষি মানুষকে 'মানুষ' করে তোলার এক অনিবার্য পথে ঠেলে দিল। ফসল উৎপাদনে ক্ষেত্রে হাজার হাজার বছর ধরে যেসব পরিবর্তন এসেছে তা বেশ ধীর গতিতেই হয়েছে। বর্তমান কালের পরিবর্তনের সাথে তুলনা করলে তা না মেনে কোন উপায় নেই। তবে খাদ্য উৎপাদনের নানা রকম হাতিয়ার আবিষ্কার উৎপাদন ব্যবস্থাটাকেই অনেকটা সহজ করে দিল। এখন থেকে ৭০০০ বছর আগে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় সেচের প্রচলন; হাল চাষের জন্য লাঙ্গল-জোয়ালের ব্যবহার; পরিবহনসহ নানা কাজে চাকার ব্যবহার ইত্যাদি কর্মকাণ্ড উৎপাদনের ধারাটাকে বদলে দিল অনেকটাই।

কৃষি কর্মকাণ্ডের সাফল্য মানুষের জীবন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে এলো। খাদ্যের সংস্থান করা কিছুটা সহজ হওয়ায় খানিকটা দ্রুতই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। কৃষি কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যও বাড়তি মানুষের প্রয়োজন হয়ে পড়লো। এখন থেকে তের হাজার বছর আগে মনে করা হয় পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল বড় জোর ১ মিলিয়ন। এখন থেকে হাজার দশেক বছর আগে যখন কৃষির শুরু হয় তখন পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ৫ মিলিয়ন। কৃষির সফলতা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ত্বরান্বিত করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১ সনে এসে জনসংখ্যা দাঁড়ালো ২০০ মিলিয়নে। আর তা বাড়তে বাড়তে ৫০০ মিলিয়নে পৌঁছেছে ১৬৫০ সনে। আর তা ১ বিলিয়নে গিয়ে পৌঁছেছে ১৮০৪ সনে। এক শত বিশ বছর অতিক্রম করতে না করতেই ১৯২৭ সনে এসে জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২ বিলিয়নে। ইতোমধ্যে ফসলের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। দেশ মহাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে ফসল আর পশু চলে গেছে কত দূর দূরান্তে। দিনে দিনে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। এতদিনে জমিতে খাদ্য উপাদানের ঘাটতি মেটাতে সার প্রয়োগ করার প্রযুক্তিও মাঠে চলে এসেছে। পৃথিবীর বহু দেশে ইতোমধ্যে যান্ত্রিক পদ্ধতির চাষাবাদও শুরু হয়ে গেছে। শুরু হয়ে গেছে জমিতে সেচ

দেবার কৌশলও। ফলে অব্যাহত রয়েছে ফসলের ফলন বৃদ্ধির কর্মকাণ্ড। আর এরই ফলশ্রুতিতে বেড়েছে আরো পৃথিবীর জনসংখ্যা। ১৯৬০ সনে এসে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ বিলিয়নে। চিকিৎসা পদ্ধতির সাফল্য এবং নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়ায় শিশু মৃত্যুর হার অনেকটা কমেছে। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে এসে তৃতীয় বিশ্বের বেশ কিছু সংখ্যক দেশে আধুনিক উচ্চ ফলনশীল জাতের আবাদ শুরু হয়ে যায়। ধান আর গমের এসব জাতের বিস্তৃতি অনেক দেশে সহজ বিপ্লব নিয়ে আসে। ১৯৭৫ সনে এসে মানুষের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪ বিলিয়নে। এরপর প্রতি এক যুগ পরপর ১ বিলিয়ন করে অতিরিক্ত জনসংখ্যা যুক্ত হওয়ায় ২০১১ সনে তা ৭ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।

কৃষির ধারাবাহিক সাফল্যকে অবলম্বন করে পৃথিবীতে নানা রকম কৃষি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এখন থেকে পাঁচশ বছর আগে কৃষি ভিত্তিক জীবন ধারা শুরু হয়েছে সারা বিশ্ব জুড়েই। অবশ্য এসময়ও খাদ্য সংগ্রহের বিষয়টি ছিল মানুষের সার্বক্ষণিক ভাবনার বিষয়। ভূমি থেকে মুক্ত হয়ে কিছু লোক ভিন্ন রকম কাজ করতে শুরু করলেও হিসেব নিকেষ করে দেখা গেছে যে মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ লোক খাদ্য উৎপাদনে ব্যস্ত থাকতো। কৃষির দক্ষতা ছিল সে সময় খুবই কম। কোন পরিবার তাদের প্রয়োজনের বেশি খাদ্য উৎপাদন করতে পারতো না। এ হিসেবটি এখন অবশ্য অনেক পাল্টে গেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে বর্তমানে পৃথিবীর ৫ জন লোকের মধ্যে মাত্র ১ জন কৃষক। এর মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ রয়েছে কেবল এশিয়াতে। মূলত ধান উৎপাদন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত রয়েছে পৃথিবীর এক বিশাল জনগোষ্ঠি।

কৃষি তথা ফসলের আবাদ মানুষ আর ভূমির সম্পর্কটাই পাল্টে দিয়েছে। ডেভিড পাইমেন্টেল নামক এক বিজ্ঞানী হিসেব নিকেষ করে এ বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। এক জন মানুষের প্রতিদিন গড়পড়তা ২৫০০ কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হলে এবং ১ গ্রাম বীজ থেকে ৩ কিলোক্যালরি পাওয়া গেলে একজন লোককে এক বৎসর খাওয়াতে

প্রয়োজন হয় প্রায় ৩০০ কেজি ফসলের বীজ। আধুনিক কালে যেসব শিকারী এবং সংগ্রহজীবী মানব সমাজ রয়েছে তাদের আবাস এলাকাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক বাস্তসংস্থান হিসেবের মধ্যে ধরে তিনি দেখিয়েছেন যে, এরকম ৩০০ কেজি বীজের জন্য আমাদের পূর্ব পুরুষদের প্রয়োজন পড়তো প্রায় ২৫০ হেক্টর জমির। কৃষি সফল হওয়ায় মাথা পিছু খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার জন্য জমির পরিমাণ অনেক নেমে এসেছে। আর বিগত শতাব্দীতে অনেক দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতি জনের খাদ্য নিশ্চিত করতে মাথা পিছু জমির প্রয়োজন আরও অনেক হ্রাস পেয়েছে। এক হেক্টর ফসলী জমি আর গোচারণ ভূমি হলে এখন ১ জন লোকের অনায়াসে চলে যায়। ফসলের উপর আমাদের নির্ভরতা নানা কারণে। এখনও সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের ক্যালরীর সিংহভাগ আসে উদ্ভিদ থেকেই। গড়পড়তা নানা রকম ফসল থেকে শতকরা ৮০ ভাগ ক্যালরীর যোগান দাতা আমাদের নানা রকম ফসল। এশিয়া এবং আফ্রিকাতে শতকরা ৯৪ ভাগ ক্যালরী আসে ফসল থেকেই। সারা বিশ্বের আমিষ চাহিদার শতকরা ৫০ ভাগের অধিক এখনও আসে ফসল থেকেই। এশিয়া আর আফ্রিকার জনমানুষের শতকরা ৭৮-৭৯ ভাগ আমিষের উৎস এখনও উদ্ভিদ। শর্করা আর আমিষ বাদ দিলে স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য, ভিটামিন আর খনিজ পদার্থেরও সিংহভাগের যোগানদাতা কিন্তু ফসলই।

একসময় হাজারো রকমের বুনো গাছগাছালির ফলমূল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো মানুষ। গত ৭-৮ হাজার বছরের আবাদিকরণ কর্মকাণ্ডের ফলে ৩০০-এর মত বুনোগাছগাছালি ফসলে রুপান্তরিত হয়েছে। দিনে-দিনে মানুষ অল্প কয়েকটি ফসলের উপর বেশিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষের সিংহভাগ খাদ্য যোগায় এখন মাত্র ১০টি ফসল। দানা শস্যের মধ্যে রয়েছে ধান, গম, ভূট্টা আর যব। কন্দাল আর কান্ড জাতীয় ফসলের মধ্যে রয়েছে সুগারবীট, ইক্ষু, গোল আলু, মেটে আলু আর কাসাবা। অন্যান্য ফসলের মধ্যে রয়েছে শীম, সয়াবিন আর বাদাম। ফল জাতীয় ফসলের মধ্যে নারকেল আর কলা। গোটা পৃথিবীর শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক ফসল উৎপাদিত হয় গম, ভুট্টা আর ধান আবাদের মধ্য

দিয়ে। পৃথিবীর চাষাবাদ যোগ্য জমির অধিকাংশ এলাকাই এরা দখল করে রেখেছে। দিন যত যাচ্ছে আমরা তত কম সংখ্যক ফসলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। অন্যদিকে দিন যত যাচ্ছে আমরা তত এক একটি ফসলের অল্প ক'টি সফল জাতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। এক দিকে কমছে ফসলের প্রজাতি বৈচিত্র্য, অন্যদিকে কমছে ফসলের জাত বৈচিত্র্যও। এ দু'টি বিষয়েরই নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। আমরা আমাদের দূর পূর্বপুরুষ তো বটেই এমনকি নিকট পূর্ব পুরুষের তুলনায় অনেক কম ফসল থেকে খাদ্য গ্রহণ করছি। দিনে দিনে বেশ কিছু ফসলের আবাদ হ্রাস পাচ্ছে। বাড়ছে ধান, গম, ভুট্টা এমনিতর অল্প ক'টি ফসলের আবাদ। অনেক দেশি ফল ফলাদির গাছের বিলুপ্তি ঘটেছে। তাছাড়া ভীষণ রকম হ্রাস পাচ্ছে ফসলের জাতের সংখ্যা। এদেশে এক সময় হাজার দশেক জাতের ধানের আবাদ হতো। কারো কারো মতে এ সংখ্যাটি পনের হাজার। বৈচিত্র্যময় এসব ধানের অধিকাংশই এখন আর ফসলের মাঠে আবাদ হচ্ছে না। সেই বালাম, সেই বিরুই, সেই বাঁশপাতা, আনারকলি, কনক তারা, সূর্যমুখী, হাসি কলমি, আটলাই, পাশপাই এমনি কত কত জাতের ধান আজ হারিয়ে গেছে কৃষকের মাঠ থেকে। এদের অনেকগুলোর ইতোমধ্যে বিলুপ্তি ঘটেছে। পাটের ছিল এদেশে ৬০০ স্থানীয় জাত।

এদের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ জাতেরই বিলুপ্তি ঘটেছে। আমাদের অতি পরিচিত বেগুনের স্থানীয় জাতের সংখ্যাও কম ছিল না। এখন জাতের সংখ্যা কমতে কমতে তা ৬০-৭০ টিতে এসে দাঁড়িয়েছে। অল্প ক'টি জাতের ভীষণ রকম সফলতার কারণে কৃষকগণ কেবল অল্প ক'টি জাত আবাদে আগ্রহী হয়ে পড়েছেন। ফলে ফসলের মাঠের বিপুল জাত বৈচিত্র এখন হ্রাস পেয়েছে। প্রায় সকল ফসলেই অল্প কটি জাতের সাফল্য অন্য জাতগুলোর প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করেছে। কৃষক আর আগের মতো সেসব জাতের বীজ নিজের সংগ্রহে রাখছে না। দিনে দিনে নানা রকম ফসলের জাত কৃষকের মাঠ থেকে নির্বাসিত হচ্ছে। এদের মধ্যে কোন কোনটা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোন কোনটা বা সংগৃহীত হয়ে ঠাঁই নিয়েছে জিন ব্যাংকের ঠাণ্ডা কক্ষে। আমাদের রুচি আর ভিন্ন মাত্রার চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছে

আধুনিক কালের ফসল। ফলন বেড়েছে সত্য, মোটা দাগে খাদ্যের চাহিদা মিটছে বটে। তবে দিন দিন অল্প ক'টি ফসল আর ফসলের জাতের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা আমাদের ভবিষ্যৎটাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। জীব বৈচিত্র্যপূর্ণ মাঠ দিন দিন বৈচিত্র্যহীন হয়ে উঠছে। আপাত প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ আমাদের স্বল্প দৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলেছে। মাঠে ফলানো হাজারো ফসলের জাত বিলুপ্ত হচ্ছে। কোন কোনটা বা ঠাঁই নিচ্ছে জিন ব্যাংকের নিভৃত কোণে। অল্প জমি আর অধিক জনসংখ্যার চাপে মোটা দাগে খাদ্য সমস্যা মেটানোই আজ দূরূহ হয়ে পড়ছে। পুষ্টি সমস্যা মেটানোর যে বিশাল দায় আমাদের ঘাড়ে চেপে রয়েছে সেদিকটাতে মনযোগ দেওয়া অনেকটাই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এখনও আমাদের দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে শতকরা ১.৪ ভাগ হারে আর গড়পড়তা প্রতিবছর জমি কমছে শতকরা কমপক্ষে ০.৫ ভাগ হারে। এ রকম এক দ্বান্দ্বিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে বৈচিত্র্যময় উৎস থেকে খাদ্য সংগ্রহের অভিযান চালানো খুব সহজ কাজ নয়। অথচ আগামী দিনের প্রয়োজনে বৈচিত্র্যময় ফসল আর ফসলের জাত সংরক্ষণেরও কোন বিকল্প নেই। মাঠ পর্যায়ে নানা রকম ফসল আর ফসলের জাত সংরক্ষণ করতে পারলে উত্তম হতো। কিন্তু প্রতিনিয়ত ফসলের উৎপাদন বিশেষ করে দানা শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ আর মাথা পিছু নিম্নতম পরিমাণ জমি তার অনুকূল নয়।

পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে এখনও বেশ দ্রুত। প্রতি বছর এখন বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়ছে ৮০ মিলিয়নেরও অধিক। সে হিসেবে এক যুগ সময় পার হলেই বিশ্ব জুড়ে মানুষ বাড়ছে ১ বিলিয়ন। ২০৫০ সনে জনসংখ্যা পৌঁছাবে ৯ বিলিয়নে। পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে বলেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোন বড় সমস্যা তৈরি করতে পারেনি এতদিন। বরং এভাবে বলা যায় যে, পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে বলে জনসংখ্যাও বেড়ে গেছে। চাহিদা মত খাদ্য না পেলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে কিছুটা হলেও শ্লথ হয়ে পড়তো তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে মানুষের বিজ্ঞানভিত্তিক ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গত একশ বছর ধরে ফসলের উৎপাদনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে গত শতকের

ষাটের দশকে এসে খর্বাকৃতি আধা-খর্বাকৃতির ধান ও গমের জাত উদ্ভাবন খাদ্য উৎপাদনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল জাতের পাশাপাশি সার, সেচ ও রোগ বালাই দমন ব্যবস্থা মিলে কৃষিতে এক সবুজ বিপ্লব সংঘঠিত হয়েছে। সে কারণে গত ৫০ বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, খাদ্য উৎপাদন মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে ছাড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর বিশ্বের জনসংখ্যা যখন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তখন খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুণ। বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাকা এখনও বেশ সচল। কিন্তু সে তুলনায় এখন ক্রমবর্ধনশীল পণ্য চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির চাকা ততটা সচল নয়। ১৯৯০ সনের পর বিশ্বের দানা ফসলের উৎপাদন বেড়েছে অল্পই। হিসেব কষলে দেখা যায় যে মাথা পিছু দানাদার খাদ্যের যোগান বরঞ্চ কমেছে। দিন দিন মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ছে। একদিকে জমি কমছে মানুষ বাড়ছে। অন্যদিকে কম জমিতে অধিক ফলন ফলানোর তাগিদ বাড়ছে। অপর দিকে দিন দিন পরিবেশ বৈরী হয়ে উঠছে। ঝড়, বন্যা, খরা, সাইক্লোন নানা রকম পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে পৃথিবী। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাটিই দিন দিন জটিল হয়ে পড়ছে। এফএও-এর হিসেব মতে ২০৫০ সনে যখন জনসংখ্যা হবে ৯ বিলিয়নে দাঁড়াবে তখন মানুষ এক ভীষণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়বে। সে সময় খাদ্যের চাহিদা মেটাতে হলে আফ্রিকার খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে ৩০০%। ল্যাটিন আমেরিকার ক্ষেত্রে তা বাড়াতে হবে ৮০% আর এশিয়ার জন্য ৭০%। এমনকি উত্তর আমেরিকায় খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে ৩০%। কাজটি যে কতটা কঠিন হবে সেটি আমাদের বুঝতে হবে।

এক জমিতে ফলাতে হবে একাধিক ফসল। আমাদের দেশেতো মাথা পিছু জমির পরিমাণ হচ্ছে ০.০৬ হেক্টর। ফলে এক জমিতে তিন ফসল ফলাবার তাগিদও বাড়ছে তাতে। প্রাকৃতিক সম্পদের অতি ব্যবহার করে অধিক ফলন পেতে চাইবে মানুষ। মাটির স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়ে পড়বে, দূষণমুক্ত পানির অভাব আরও বাড়বে, দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। বাড়বে উৎপাদন ব্যয়। ফলে উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ সীমিত হয়ে

পড়বে। প্রচলিত ফসলের জাত আর প্রচলিত উৎপাদন কৌশল কাঙ্ক্ষিত চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হবে। আগামী দিনের মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটাতে হলে বাড়াতে হবে ফসলের ফলন। কেবল প্রচলিত ফসল উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে আজকের ও আগামী দিনের চাহিদা পূরণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে পারে। আজ সময় এসেছে আরও অধিক ফসলের হাইব্রিড জাত সৃষ্টি করে ফসলের ফলন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা। রোগ বালাই কীট পতঙ্গের আক্রমণে আজও ফসলের ফলন শতকরা ২০-৩০ ভাগ হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া লবণাক্ততার বিস্তার, বন্যা ও খরার মাত্রা বৃদ্ধি জনিত কারণে পৃথিবীর কোন কোন দেশে ফলন হ্রাস পাচ্ছে। প্রচলিত ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে আজ জিন প্রযুক্তির মেল বন্ধন ঘটাতে হবে। জীব জগতের যে কোন উৎস থেকে কাঙ্ক্ষিত জিন কর্তন করে নিয়ে ফসলের কোষে ক্রোমোজোমের সাথে তা জুড়ে দিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা এখন আর স্বপ্ন নয়। পৃথিবীর কোন কোন দেশে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট জি এম ফসল আজ আবাদ করা হচ্ছে। এসব প্রযুক্তি এখন আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদেরও নাগালের মধ্যে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক বৈরী পরিবেশ সহনশীল জাত সৃষ্টির লক্ষ্যে জিন প্রযুক্তির সার্থক প্রয়োগ করা গেলে ফসলের ফলন হ্রাস যথেষ্ট কমিয়ে আনতে পারলে সারা বিশ্বের কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানোর কাজটি তাতে খানিকটা সহজ হবে।

ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া
অধ্যাপক
জেনেটিক্স এন্ড প্লান্ট ব্রিডিং বিভাগ ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ চাই

মোস্তাফা জব্বার

১. প্রেক্ষিত:

মানব সভ্যতার তৃতীয় স্তরে আমরা। এই তৃতীয় স্তরের নাম তথ্যযুগ। এই যুগের চূড়ান্ত লক্ষ্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। অতীতের সবকিছু বদলে একটি নতুন পৃথিবী, একটি নতুন জীবনধারা, নতুন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে এই তথ্যযুগে। আমরা অনেকেই এখনো সম্ভবত ধারণাই করতে পারিনা, কি হবে এই যুগের চরিত্র। চারপাশে ছোট খাটো লক্ষণ এবং পরিবর্তন দেখে কেউ কেউ মনে করছেন, কিছু একটা অদল-বদল হবে হয়তো। কবে আসবে এই পরিবর্তন, কখন কোন পথে বদলে যাবে আমাদের দুনিয়াটা-সেটি কিন্তু আমরা নিশ্চিত নই। এমন হওয়াটাও বিচিত্র নয় যে, আমি নিজেও ঠিক আন্দাজ করতে পারছিনা, কেমন হবে আমাদের প্রত্যাশিত সেই সমাজ। তবে আমি একটি বিষয়ে নিশ্চিত যে, আমরা চাইলেই সেই সমাজটাকে আমাদের মতো করেও গড়তে পারি। আমরা যদি কোন উদ্যোগ না নিই, তাহলেও এই সমাজটা তার মতো করে বদলাবে এবং কোন না কোন এক সময়ে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে পৌছাবে। অথবা হতে পারে ততোদিনে নতুন কোন সমাজ-নতুন কোন ব্যবস্থা মানবজাতির সামনে উপস্থিত হবে। তবে আমাদের উদ্যোগ এটিকে আমাদের পছন্দ অনুযায়ী বসবাসের উপযোগী এবং কাঙ্ক্ষিত সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করবে। এজন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টার নাম হতে পারে ডিজিটাল বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে প্রায় অজানা-অচেনা এই ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং এর মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার কর্মসূচী পেশ করার জন্য আমাদেরও প্রয়োজন চারপাশে বিদ্যমান অবস্থাটি পর্যবেক্ষণ ও মুল্যায়ন করা। এরই ভিত্তিতে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচী নিয়ে একটি আন্দোলন গড়ে তুলবো। দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশসহ দুনিয়ার প্রায় সর্বত্র ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তণের কথা বলা হলেও স্পষ্ট করে বাংলাদেশের জন্য কেউ কখনো একটি সার্বিক কর্মসূচী প্রস্তুত করেনি। আমরা বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ করে এই কর্মসূচীটি চূড়ান্ত করতে চাই।

২. মানব সভ্যতার যুগ বিবর্তণ: আধুনিক মানুষের ইতিহাস প্রায় লাখো বছরের। নানা বিবর্তণের মধ্য দিয়ে আদিমানুষ আজকের পর্যায়ে এসেছে। এর মাঝে মানুষের জ্ঞান বেড়েছে। সে একের পর এক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে এবং সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ দিনে দিনে তার জ্ঞানকে আরো বাড়িয়েছে। আদি মানুষ বস্তুত কিছুই জানতোনা। একসময়ে সে পাথরের ব্যবহার শিখে। পাথর দিয়ে সে নানা অস্ত্র তৈরী করতে শিখে। এই অস্ত্র তার প্রতিকূল অবস্থা থেকে আত্মরক্ষা এবং জীবনধারণে নানাভাবে সহায়তা করেছে। এক সময়ে মানুষ পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালাতে শিখে। সেই আগুনকেও সে তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শিখে। কিন্তু মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় ছিলো শস্য ফলাতে জানা। শস্যের বীজ থেকে ফসল উৎপাদন করতে জানার আগে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ফসল-ফল ফলাদি আহরণ করে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতো। কৃষি কাজ তাকে প্রকৃতির কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করা থেকে রক্ষা করে এবং অগ্রগতির পথে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। সে নিজে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পছন্দনীয় সময়ে উপযুক্ত জমিতে খাবার উৎপাদন করতে শেখে। প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে তার নিয়ন্ত্রণ। দিনে দিনে তার কৃষির জ্ঞান বাড়তে থাকে। সে একের পর এক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে। উচ্চ ফলনশীল বীজ-ফসল দিয়ে সারা দুনিয়ার ক্রমবধর্মান মানুষের ক্ষুধার চাহিদা পূরণ

করার উপায়ও মানুষ আয়ত্ত্ব করে। যদিও প্রাগৈতেহাসিক সময় থেকে মানুষ কৃষি কাজ করতে শেখে তথাপি কৃষির বিপ্লবের সূচনা হয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ঐ সময়ে মানুষ উন্নত চাষাবাদের সাথে পরিচিত হয়। উন্নত যান্ত্রিক হালচাষ, উন্নত বীজ, সার-কীটনাশক, সেচ ইত্যাদি ছাড়াও সে ক্রমশ উন্নত শস্যের বীজ উৎপাদনে সক্ষম হতে থাকে। তবে বাংলাদেশে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত উন্নত চাষাবাদ প্রবর্তিত হয়নি। মাত্র বিগত শতকের ষাটের দশক থেকে এদেশে সার-কীট-নাশক বা উচ্চ ফলনশীল বীজ এবং যান্ত্রিক চাষাবাদ চালু হয়। তবে এখনো বাংলাদেশের কৃষক কৃষিতে অতি উচ্চ প্রযুক্তি তেমনভাবে ব্যবহার করছেনা। বলা যেতে পারে, আমরা বাংলাদেশে এখনো আধা-উন্নত কৃষিব্যবস্থানির্ভর।

এরই মাঝে উন্নত দুনিয়াতে কৃষিবিপ্লব শিল্পবিপ্লব দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। আঠারো শতকে প্রথমত ব্রিটেনে, পরে ইউরোপে এবং আমেরিকায় তারও পরে আফ্রিকা-এশিয়ায় শিল্প বিপ্লব শুরু হয়। "শিল্পবিপ্লব" শব্দটি প্রকৃতার্থে ১৭৫০ থেকে ১৮৩০ সময়কালে গ্রেটব্রিটেনের কৃষিনির্ভর গ্রামীণ মানুষের নগরভিত্তিক কারখানার জীবনে রূপান্তরিত হওয়াকে বোঝায়। (মূল ইংরেজী সূত্র: ১৬ মার্চ ২০০৭: ১২:৫৩ বাংলাদেশ সময়, http://www.bergen.org/technology/indust.html) ১৭৪০ সালে ব্রিটেনে একটি কাপড়ের কল স্থাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই শিল্প বিপ্লব। উনিশ ও বিশ শতকে সেই শিল্প বিপ্লবের ছোয়া ইউরোপ-আমেরিকা-এশিয়া-আফ্রিকাসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। এশিয়ার দেশ জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং, চীন এই শিল্প বিপ্লবের স্পর্শে ইউরোপ আমেরিকার উন্নত দেশগুলোর কাতারে পৌছে যায়। এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ছোটমাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উদীয়মান উন্নত দেশের কাতারে নাম লেখাতে সক্ষম হয়। অবশ্য ভারত বিগত অর্ধ শতাব্দীতে কৃষিরও ব্যাপক উন্নয়ন করে।

২.১ তথ্যযুগ: আমরা জেনেছি, মানবসভ্যতা আগুনের যুগ, পাথরের যুগ, কৃষি যুগ এবং শিল্পযুগ অতিক্রম করেছে। এখন আমরা তথ্যযুগে পা

দিয়েছি। খুব সঙ্গত কারণেই অতীতের ডাইনামিকস এই যুগে কাজ করছেনা। এই যুগের উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প সম্পর্ক, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, পরিবারের গঠন, জীবনযাত্রা, সমাজের ভেতরকার পরিবর্তনের ধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, রাষ্ট্র পরিচালনা কোনটাই কৃষি-শিল্প যুগের ছকে চলছেনা। মানুষের হাতে এখন প্রতিদিন নতুন নতুন প্রযুক্তি আসছে। তার সংকট যেমন বদলাচ্ছে, তেমনি সেই সংকট থেকে উত্তরণের পথও সে দ্রুতই পাচ্ছে। বিশ্বখ্যাত লেখক এলভিন টফলার তার ১৯৮০ সালে প্রকাশিত 'দি থার্ড ওয়েভ' বইতে তথ্যযুগের একটি কল্পিত রূপরেখা প্রদান করেছেন। তার মতে, প্রথম ওয়েভ হলো কৃষিবিপ্লবের পরের সমাজ। এই সমাজ বন্য প্রাণী শিকার করে বেঁচে থাকার যুগের অবসান ঘটায়। দ্বিতীয় ওয়েভটি হলো পরমাণু পরিবার, কারখানা ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা এবং বৃহৎ কর্পোরেশনের যুগ। দ্বিতীয় ওয়েভের পরের সমাজকে টফলার শিল্পনির্ভর, গণ উৎপাদন, গণ বিতরণ, গণভোক্তা, গণশিক্ষা, গণমাধ্যম, গণবিনোদন, গণঅবকাশ, এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের যুগ বলেছেন। এইসব বিষয়ের সাথে প্রমিতকরণ, কেন্দ্রীভূতকরণ, মনোনিবেশ এবং সমন্বয় যুক্ত করলে এমন একটি সংস্থা পাওয়া যাবে যার নাম আমলাতন্ত্র। তৃতীয় ওয়েভটি হলো শিল্পায়নউত্তর সমাজ। ১৯৫০-এর পর এই সমাজ গড়ে উঠতে থাকে।

টফলার অনেকের মতো একে তথ্যযুগ বলেছেন। (সূত্র ওয়াইকিপিডিয়া, ২২ মার্চ ২০০৭, রাত নটা) এলভিন টফলার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এটি মনে করেন যে, আমরা অনেকদিন ধরেই তথ্যযুগে অবস্থান করছি। তিনি যে তথ্যযুগের বিবরণ দেন তাতে রূপরেখাটি এরকম: তথ্যযুগে শিল্পযুগের গণ-ব্যবস্থার বিপরীত মেরুতে যাবো আমরা। সবকিছুর জন্যই একই ব্যবস্থা এমন প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন; শিক্ষাব্যবস্থা, কারখানা, সরকার, গণমাধ্যম, গণ-উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিলীন হবে। অর্থাৎ কৃষি যুগ পার হয়ে মানুষ যেসব প্রতিষ্ঠান বা কাঠামো, টফলারের ভাষায় আমলাতন্ত্র, গড়ে তুলে তথ্যযুগ সেগুলোকে বদলে দেবে।

আমার কাছে মনে হয় টফলার তথ্যযুগের শুরুটা দেখে যেমন ধারণা করেছিলেন পরিবর্তনটা তার চাইতে বেশী হচ্ছে। যদিও টফলার ভেবেছেন আমলাতন্ত্র বিলীন হবে, আমার কাছে মনে হয়, তথ্যযুগের পালাবদলে একটি নতুন ধরনের আমলাতন্ত্র টিকে থাকবে। তবে টফলার রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পর্কে যে বক্তব্য দিয়েছেন সেই প্রক্রিয়াটি এরই মাঝে শুরু হয়েছে। টফলার বলেন, 'তথ্যযুগে প্রচলিত জাতিরাষ্ট্র ভেতর ও বাইরে থেকে হামলার শিকার হবে।'

তার মতে শিল্পযুগ যেসব বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে যেসব জাতি রাষ্ট্র জন্ম দিয়েছে সেসব জাতিরাষ্ট্র সংকটে পড়বে। এই সংকট একদিক থেকে বাইরে থেকে আসবে। টফলার সম্ভবত বিশ্বায়নকে বাইরের এই হামলার কারণ বলে মনে করেন। অন্যদিক থেকে রাষ্ট্রের ভেতর থেকে তিনি যে হামলার কথা বলছেন সেটিও বিশ্বায়নের প্রভাবে হলেও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনকে এজন্য দায়ী বলা যায়। তিনি বিশেষত ধীরে ধীরে নাগরিকদের মাঝে ঐকমত্যের অভাব গড়ে ওঠাকে এজন্য দায়ী করেন। টফলারের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একুশ শতকে মার্কিন রাজনৈতিক অস্থিরতা, গ্রাম ও শহরের বিরোধে চীনের রাজনৈতিক গোলযোগ, নির্বাচনের পর জার্মানীতে সংকট, ইসলামি দুনিয়ার পরিবর্তন ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়। টফলার তার বইতে জাতিরাষ্ট্রগুলোর আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতি আগ্রহের কথাও বলেন।

যাহোক, টফলার শিল্পায়নের যেসব ভাঙ্গচুরের কথা বলেন তার অনেক কিছুই এখন ভাঙ্গতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রের অন্তর্গত পরিবর্তনের উৎস হিসেবে তিনি নতুন নতুন সংস্থার কথাও উল্লেখ করেছেন, যেসব সংস্থা জাতিরাষ্ট্রের চাইতে কম শক্তিশালী নয়। বহুজাতিক কোম্পানী-সংস্থা, ধর্মীয় গোষ্ঠী এমনকি সন্ত্রাসী সংস্থাকেও তিনি আক্রমণকারী হিসেবে গণ্য করেন।

The eclipsing of monetary wealth by knowledge and information as the primary determinant of power and its distribution. The eclipsing of manufacturing and manufacturing goods by knowledge- production and information-processing as the primary economic activity. This

was significantly expanded on in the sequel Powershift, where Toffler nearly drew the line between the two along gender lines, coining the term "Material-Ismo" (a play on "machismo") to represent the infatuation with the industrial era world of manufacturing (as opposed to paper-pushing), and equating value with product (as opposed equating value with information). The criticism came down particularly hard on the former Stalinist societies, that have in recent years seen a substantial dislocation, particularly along gender lines, with female life expectancy now as much as 10 years greater than male life expectancy throughout the former USSR.The emergence of various high technologies, such as cloning, global communications networks, nanotechnology, etc. However, these aspects were discussed in greater depth in Future Shock and somewhat deemphasized in the Third Wave. A transformation of the very character of democracy, itself, from rule-by-periodic polling at the election booth, toward a more direct interaction between the government and its populace. To a large extent, this has already emerged with the rise of the Internet, though it has not yet congealed in the form of a fundamental revision of the constitution of any state. The trend toward on-line voting in the United States, following the election crisis of 2000, may be seen as a first step in this direction. (সূত্র ওয়াইকিপিডিয়া, ১৫:৪০, ২২ মার্চ ২০০৭)

এলভিন টফলারের মতবাদের পর দুনিয়া দুই যুগের বেশী সময় পার করেছে। এরই মাঝে আমরা তথ্যযুগের জ্ঞানভিত্তিক সমাজের কথা শুনছি। টফলারের বইটির আলোচনা করতে গিয়ে মাইকেল ফিনলে মন্তব্য করেন, The first wave of transformation began when some prescient person about 10,000 years ago, probably a woman, planted a seed and nurtured its growth. The age of agriculture began, and its significance was that people moved away from nomadic wandering and hunting and began to cluster into villages and develop culture. The second wave was an expression of machine muscle, the

Industrial Revolution that began in the 18th century and gathered steam after America's Civil War. People began to leave the peasant culture of farming to come to work in city factories. It culminated in the Second World War, a clash of smokestack juggernauts, and the explosion of the atomic bombs over Japan. Just as the machine seemed at its most invincible, however, we began to receive intimations of a gathering third wave, based not on muscle but on mind. It is what we variously call the information or the knowledge age, and while it is powerfully driven by information technology, it has co-drivers as well, among them social demands worldwide for greater freedom and individuation. (http://www.skypoint.com/members/mfinley/toffler.htm)

মাইকেল ফিনলের মতে কৃষি যুগে সম্পদ ছিলো জমি। শিল্পযুগে সম্পদ তিনটি বিষয়নির্ভর হলো, জমি, পুজি এবং শ্রম। এই যুগে পণ্য মানে ছিলো বস্তুগত পণ্য। কিন্তু তথ্যযুগে পণ্য কেবল বস্তুগত পণ্য নয়। এই যুগে জ্ঞান হচ্ছে পণ্য। এই পণ্যের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি একবার উৎপাদন করলে বারবার তা ব্যবহার করা যায়।

২.২ তথ্যযুগের উদ্ভব: উনিশ শতকে জন্ম নেয় টেলিফোন-টেলিগ্রামসহ যোগাযোগের নানা উপকরণ। বিশ শতকের মাঝামাঝি কম্পিউটার বাস্তবতায় পরিণত হয়। বাণিজ্যিক কম্পিউটার দুনিয়া দেখতে পায়। ১৯৫৭ সালে জন্ম নেয় আরপা নেট। ১৯৬৯ সালে প্যাকেট সুইচিং ধারণা কাজে লাগানো শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে ৫০০০ হোস্ট হয় ইন্টারনেট/আরপানেটের। ১৯৯০ সালে জন্ম হয়ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব-এর। ১৯৯২ সালে যাত্রা শুরু হয় সার্ফিং দ্য ইন্টারনেটের। সম্ভবত এজন্যই বলা হয় ১৯৯২ সাল থেকে (সূত্র: ওয়াইকিপিডিয়া-অনলাইন বিশ্বেকোষ) দুনিয়া শিল্পযুগের স্তর অতিক্রম করে তথ্যযুগে পদার্পণ করতে শুরু করে। তবে এই দাবীটি যথার্থ মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কেননা এর আগেই দুনিয়ায় ব্যাপকভাবে আইসিটি প্রযুক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে। বরং বলা হয় যে, উনিশ শতক থেকেই টেলিকমিউনিকেশন এবং কম্পিউটারের নানা

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দুনিয়ায় তথ্যযুগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। ১৯৬৯-৭১ সময়কালে মাইক্রোপ্রসেসরের আবির্ভাব কার্যত একটি নতুন দুনিয়া তৈরীর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। মাইক্রোপ্রসেসর এবং কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সফটওয়্যারের দ্রুত উন্নতির পাশাপাশি মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের সর্বব্যাপী প্রসারও দুনিয়ায় তথ্যযুগকে অনিবার্য করে তুলে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে একুশ শতককে-দুই হাজার বা দুই হাজার এক সাল থেকে তথ্যযুগের সূচনা বলেও মনে করা হয়।

এখানে একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা দরকার যে, তথ্যযুগ কার্যত মানুষের যোগাযোগ দক্ষতার পরিণতি। প্রায় দুই লাখ বছর আগে মানুষ কথা বলতে শুরু করার মধ্য দিয়ে তার যে বিবর্তণের ধারার সৃষ্টি করে তথ্যযুগ তারই সর্বশেষ পরিণতি। আমরা স্মরণ করতে পারি ৩০ হাজার বছর আগে মানুষ চিহ্ন-প্রতীক ব্যবহার করতে শুরু করে। ৭ হাজার বছর আগে মানুষ শুরু করে লেখালেখি। এর পাশাপাশি পেপিরাস (খ্রীষ্টপূর্ব ৩ হাজার), অক্ষর (খ্রষ্টিপুর্ব ২ হাজার), সংবাদপত্র (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯), কাগজ (প্রথম শতাব্দী), কলম (দশম শতাব্দী), ছাপাখানা (১৪৫৪), পেন্সিল (১৫ শতাব্দী), টাইপরাইটার (১৭১৪-১৮৮৭) ইত্যাদির আবিষ্কার মানুষকে আজকের পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে। ১৮৩৮ সালে টেলিগ্রাফ, ১৮৪৮ সালে টেলিফোন, ১৮৯৬ সালে রেডিও এবং ১৯২৭ সালে টেলিভিশন আবিষ্কার আমাদেরকে তথ্যযুগে পৌছাতে সহায়তা করেছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, এসবের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই যুগের নিউমিডিয়ার উদ্ভবও হয়েছে।

২.৩ জ্ঞানভিত্তিক সমাজের সংজ্ঞা: বিশ্ব বিজ্ঞান ফোরাম জ্ঞানভিত্তিক সমাজের একটি সংজ্ঞা প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা আছে, A knowledge-based society is an innovative and life-long learning society, which possesses a community of scholars, researchers, engineers, technicians, research networks, and firms engaged in research and in production of high-technology goods and service provision. It forms a national innovation-production system, which is integrated into international networks of knowledge production, diffusion, utilization, and protection. Its

communication and information technological tools make vast amounts of human knowledge easily accessible. Knowledge is used to empower and enrich people culturally and materially, and to build a sustainable society.
(সূত্রঃ ১৬ মার্চ ২০০৭ঃ দুপুর ১২:৫৩ ঘণ্টা), http://www.sciforum.hu/index.php?image=update&content=up_knowledge_based_society

যদি আমরা উপরের অনুচ্ছেদটির বাংলা ভাবানুবাদ করি তবে তাতে বোঝা যাবে যে, একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ হচ্ছে একটি সৃজনশীল আজীবন শিক্ষণের সমাজ। এই সমাজে পণ্ডিত, গবেষক, প্রকৌশলী, কারিগর, গবেষণা নেটওয়ার্ক এবং উচ্চ প্রযুক্তির পণ্য ও সেবা দানে সক্ষম প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি সম্প্রদায় থাকবে। এর ফলে একটি জাতীয় সৃজনশীল উৎপাদন পদ্ধতির জন্ম নেবে। এই জাতীয় ব্যবস্থাটি আবার আন্তর্জাতিকভাবে যুক্ত হবে জ্ঞান সৃষ্টি, বিতরণ, প্রয়োগ ও রক্ষার বিশ্ব নেটওয়ার্কে। এর তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কারিগরি টুলস বিপুল বিশাল জ্ঞানকে খুব সহজলভ্য করবে। এই সমাজে জ্ঞানকে ব্যবহার করা হবে মানুষকে সাংস্কৃতিক ও বস্তুগতভাবে ক্ষমতাবান ও সমৃদ্ধ করে একটি কার্যকর সমাজ গঠন করার জন্য। আমাদের মনে রাখতে হবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ হচ্ছে তথ্যযুগের- ডিজিটাল লাইফস্টাইলের চূড়ান্ত রূপ। ঊনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুতে শুরু হওয়া কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য যেমন ছিলো শ্রেণীহীন সমাজ, তেমনি আমাদের ডিজিটাল বিশ্বের তথ্যযুগীয় সমাজ কাঠামোটি হলো জ্ঞানভিত্তিক সমাজ। এই সমাজটিই আমরা ডিজিটাল রূপান্তরের শেষ পর্যায়ে পাবো। এটি স্তরে স্তরে তৈরি হবে। সমাজ-রাষ্ট্রের ডিজিটাল রূপান্তর যতো দ্রুত হবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে আমাদের যাত্রাই ততো দ্রুত হবে।

২.৪ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ, এনালগ অতীত-ডিজিটাল ভবিষ্যতঃ উন্নত দুনিয়ায় যে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয় তার সবচেয়ে বড় উপকরণটি হলো চাকা-গিয়ার। বাষ্পচালিত ইঞ্জিন থেকে শুরু করে নানা ধরনের জ্বালানী

দিয়ে পরিচালিত এসব যন্ত্রপাতি এনালগ পদ্ধতিতে কাজ করতো। কিন্তু দিনে দিনে সেইসব যন্ত্রপাতি এনালগত্ব বিদায় করে ডিজিটাল হচ্ছে। চাকা-গিয়ারের জায়গা নিচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর। একতরফা কেবলমাত্র হার্ডওয়্যারের জায়গায় এখন যন্ত্রগুলো হচ্ছে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বিত রূপ। ফলে এনালগ পদ্ধতিটি হয়ে গেছে আমাদের অতীত। আমাদের ভবিষ্যতটা হলো ডিজিটাল। এই ডিজিটাল দুনিয়ার গন্তব্যটি হলো জ্ঞানভিত্তিক সমাজ।

২.৫ চিপসনির্ভরতা নতুন জ্ঞান: সকলেই লক্ষ্য করবেন যে, এরই মাঝে শিল্প কল-কারখানা যন্ত্রপাতি যেমন চিপস নির্ভর হয়েছে, যেমন টেলি যোগাযোগ মাইক্রোপ্রসেসরনির্ভর হয়েছে, তেমনি নিরাপত্তা হয়েছে চিপসবেসড-বায়োমেট্রিক্সনির্ভর। এই সময়ে সর্বস্তরের মানুষের জন্যই জ্ঞান এতোই জরুরী হয়েছে যে, একজন অতি সাধারণ কৃষককে এখন জানতে হয়, কেমন করে হাইব্রিড- জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারিং করা সুপার রাইসের-হাইব্রিড-জেনেটিক সব্জির চাষ করতে হয়। লাঙ্গলের ফলা যে কেবল পাওয়ার টিলার-ট্রাক্টর হয়েছে তাই নয়, পানির সেচযন্ত্রে গ্যাস ব্যবহারের বিষয়টি না জানলে সে তার ব্যয় কমাতে পারেনা। এখন তাকে ভিয়েতনামের ড্রামসিডার চিনতে হয়-জানতে হয় এর ব্যবহার। মাছের উন্নত মানের পোনা বা মনোসেক্স তেলাপিয়ার কথা না জানলে সে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেনা। লবণ চাষে তাকে জানতে হয় পলিথিন প্রযুক্তি কি জিনিষ। মুরগীর রাণীখেত রোগ জানলেই তার খামারি জীবন চলেনা, তাকে বার্ড ফ্লু কি এবং সেই আপদ থেকে বাঁচার উপায় কি, তা জানতে হয়। গরুর খামার বা মুরগীর খামার যাই হোক না কেন তার ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করতে হয় কম্পিউটার। একসময়ে তার বাজারজাতকরণ, মার্কেট তথ্য পেতে হবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। গার্মেন্টস-এর মেয়েটিকে জানতে হয় মাইক্রোপ্রসেসর বেজড কাটিং-স্টিচিং যন্ত্র অপারেট করতে। তাকেও একটি এটিএম কার্ড দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে হয়। গাড়ির মেকানিককে এখন পিসিবি সম্পর্কেও জানতে হয়। ব্যবসায়ীকে এখন কেবল মোবাইল ফোন নয় ই-ব্যাঙ্কিং থেকে ইন্টারনেট

যোগাযোগ সবই করতে হয়। ফ্যাক্স বা ফিক্সড টেলিফোন এখন প্রায় ডাইনোসর হবার যোগাড়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যোগাযোগ বা পারিবারিক সামাজিক সম্পর্ক এখন পেয়েছে এক নতুন চেহারা। এমনকি ইন্টারনেটে-মোবাইল ফোনে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিয়ে শাদি হয়ে যাচ্ছে এই বাংলাদেশেই। পারিবারিক-ব্যক্তিগত সম্পর্ক এখন মোবাইল-ইন্টারনেট যুগে কেমনটা হয়েছে সেটি সম্ভবত নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। অর্থনীতির চালিকা শক্তি এখন জ্ঞান। যারা দুনিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার সামান্য খোঁজখবর রাখেন তারা জানেন শিক্ষার পাঠক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষার উপকরণ ও বিষয়বস্তুর আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। যে ডাক্তার প্রতিদিন ইন্টারনেটে প্রবেশ করেন না, গবেষণা সাময়িকী পাঠ করেন না-নতুন নতুন ঔষধের খবর রাখেন না কিংবা নতুন নতুন আবিস্কারের খবর রাখেন না-তার জন্য চিকিৎসা করা কঠিন। এমনি করে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, উদ্যোক্তা সকলের জন্যই জ্ঞান-নতুন নতুন জ্ঞান খুবই জরুরী বিষয়। সবচেয়ে কঠিন হলো, প্রতিনিয়ত এই জ্ঞানের পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত থাকা। এর সাথে খাপ খাইয়ে চলা কঠিনতম।

২.৬ একুশ শতকের শুরুতে বিশ্ব পরিস্থিতি: টফলার বা অন্যরা এখন থেকে দুই তিন দশক আগে তথ্যযুগের যে অবস্থাটি কল্পনা করেছিলেন তার চাইতে দুনিয়াটা অনেকটাই বেশী বদলে গেছে। সারা দুনিয়া এখন অনুভব করে যে আমাদের তথ্যযুগের যাত্রাটা অনিবার্য। কোনভাবেই আমরা একে এড়িয়ে যেতে পারবো না। দুনিয়ার সার্বিক অবস্থা এমনই: ২০০৭ সালে বিশ্বের ৫০ কোটি লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করে-দুনিয়ার শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় আছে। সূতরাং ডিজিটাল বিশ্ব এখন বাস্তবতা। সেই লক্ষ্যেই দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলো এখন এই যুগের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিষয়টি বিশ্বসংস্থার নজরে এলে ২০০২ সালের জানুয়ারীতে জাতিসংঘ তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর জন্য একটি বিশ্ব সম্মেলন করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। বিশ্ব টেলিকম্যুনিকেশন ইউনিয়ন এটির আয়োজনে বড় ভূমিকা পালন করে। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে জেনেভায় এই সম্মেলনের

প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিশ্বের ১৭৫টি দেশ অংশ নেয় এবং একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে। এরপর ২০০৫ সালে তিউনিশিয়ায় এর দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের দুই পর্বেই কার্যত তথ্যপ্রযুক্তি-ইন্টারনেট, ডিজিটাল ডিভাইড ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়। তবে সেই থেকেই দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলো একটি ডিজিটাল ব্যবস্থার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে থাকে। অনেক রাষ্ট্র ইন্টারনেট-আইসিটি এসব বিষয়ের বাইরে আরো অনেক কিছু নিয়েই কার্যক্রম গ্রহণ করে। অনেক দেশেই চমৎকার সব অগ্রগতি সাধিত হতে থাকে।

– আফ্রিকার দেশ রোয়ান্ডা ২০২০ সালে দেশটাকে একটি প্রযুক্তিভিত্তিক মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তর করতে চায়।
– পাকিস্তান দেশটিকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে রূপান্তর করতে চায়। পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার যেমন পাঞ্জাব ই-ভর্নমেন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে।
– ভারতের কেন্দ্রিয় সরকার ও প্রায় সকল রাজ্য সরকারতো বটেই এমনকি আমাদের পাশের বাড়ী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এখনি ৫০০ কোটি রুপী খরচ করছে ডিজিটাল সরকার গঠনের জন্য। ভারত ২০০৯ সাল নাগাদ ৩.৩ বিলিয়ন ডলার খরচ করছে তার ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য।
– স্লোভাকিয়া জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের কর্মসূচী নিয়েছে।
– ব্রাজিলের ২৬টি প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চল ব্রাসিলিয়ার প্রতিটিতে আছে ই-সরকার।
– ওজবেকিস্তানের তরমুজ চাষী পর্যন্ত তার খেতের পাশে বসে ল্যাপটপ ব্যবহার করে। সারা বিশ্বে এমন লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত তৈরী হচ্ছে প্রতিদিন।
– নিউজিল্যান্ড ২০০৭ সালের মাঝে সরকারের তথ্য, সেবা এবং কাজের প্রক্রিয়া তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করবে। ২০১০ সালের মাঝে নিউজিল্যান্ডের সরকার ব্যবস্থা পাল্টে যাবে। এই সময়ে সরকার ও তার সহযোগী সংস্থাগুলো সরকারের সেবা ও তথ্য সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্তিভিত্তিক করবে। ২০২০ সালের মাঝে সরকারের সাথে জনগণের সম্পর্ক নেটওয়ার্ক প্রযুক্তিভিত্তিক করা হবে। নিউজিল্যান্ডের তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ঐ দেশের জীবনযাত্রার মান থেকে সকল কিছুতেই আইসিটি প্রয়োগ করে আমুল পরিবর্তনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। তারা এই রূপান্তরকে ডিজিটাল নিউজিল্যান্ড বলে আখ্যায়িত করেছে। যে কেউ নিউজিল্যান্ড সরকারের ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত দেখে আসতে পারেন। তাদের ওয়েবসাইটে ডিজিটাল নিউজিল্যান্ড সংক্রান্ত বেশ কিছু দলিলাদি আছে যা ডাউনলোড করে আমরা আমাদের কর্মসূচীকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারি। আমাদের মনে হতে পারে নিউজিল্যান্ডের মতো দেশতো এমন কার্যক্রম নিতেই পারে। কিন্তু কোথায় তারা আর কোথায় আমরা?

– কিন্তু যদি ঘটনাটি আমাদের পূর্ব সীমান্তের মায়ানমারকে নিয়ে হয় তবে কেমন হবে। আমরা একটি ওয়েবসাইট থেকে মিয়ানমার বিষয়ক একটি খবর তুলে ধরছি। মিয়ানমার একটি কম্পিউটারভিত্তিক ই-সরকার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছে। দেশের নতুন রাজধানী নাই পিয়াই তাও-এ প্রতিষ্ঠিত এই সরকার ব্যবস্থায় কাগজের ফাইল পদ্ধতি ডিজিটাল পদ্ধতি দিয়ে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। এক কোটি বিশ লাখ ডলার বা প্রায় ৮৪ কোটি টাকার এই প্রকল্পে ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ও সরকারী কর্মচারী ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত আছে। সরকারী ডাক ও টেলিযোগাযোগ সংস্থা এটি বাস্তবায়ন করছে। এই ব্যবস্থার ফলে কেবল সরকারী সংস্থাগুলোকেই যুক্ত করা হবেনা, এর ফলে গত অর্থ বছরে স্থাপিত জাতীয় ডাটা সেন্টারের সাথেও যোগাযোগ স্থাপিত হবে। উল্লেখ্য এরই মাঝে মিয়ানমার ই-ভিসা, ই-পাসপোর্ট, ই-সংগ্রহ, ই-ডিপারচার ফরম ইত্যাদি চালু করেছে। আমি ধারণা করি, নাফ নদীর ওপারের এই দেশটির ডিজিটাল কর্মসূচী আমাদেরকে লজ্জা দিতে পারে। আমরা কেবল তাদের রুই মাছের খবর রাখছি-তারা যে তথ্যপ্রযুক্তিতে আমাদেরকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে সেটি ভাবতেই পারছিনা।

– প্রখ্যাত আরবনিউজ পত্রিকার ১৬ জানুয়ারীর খবর, ÒPrince Muqrin, chief of General Intelligence, said yesterday that the Kingdom, as part of its SR3 billion e-government initiative, would lay down a full-fledged foundation for the system well before the

target year of 2010. The initiative, dubbed Yesser (Arabic for "Simplify"), aims to make Saudi society more digitally literate and to streamline government bureaucracy. "The next stage in the e-government implementation plan will be to launch a significant awareness campaign to encourage the general public to embrace e-governance, while explaining the key benefits to officials of the Saudi government agencies, businesses and society in general," said Prince Muqrin." পত্রিকাটির খবরে সরকারী কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে একথা বলা হয় যে ভবিষ্যতে কোন সৌদি নাগরকিকে সরকারী অফিসে শারিরীকভাবে উপস্থিত হতে হবেনা। আমরা যদি ই-গভর্নমেন্ট লিখে ইন্টারনেটে একটু সন্ধান করি তবে চীন, উগান্ডা, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইটালি,আয়ারল্যান্ডসহ ইউরোপের সকল দেশ, উত্তর আমেরিকার দেশসমূহ, জাপান, হংকং, ম্যাকাও, ব্রুনেই, সিঙ্গাপুর (১.৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে), অষ্ট্রেলিয়া, বুলগেরিয়া, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশেরই ডিজিটাল রূপান্তরের বিবরণ পাবো।

২.৭ বাংলাদেশে কৃষির বিকাশ ও শিল্পায়ন: বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। পরিসংখ্যাণ ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী এখনো দেশের শতকরা প্রায় ৬০ জন মানুষ কৃষিনির্ভর। অথচ দেশের বার্ষিক গড় আয়ের শতকরা মাত্র ২২ ভাগ কৃষি থেকে আসে। সাম্প্রতিক কালে মৎস্য ও হাঁস-মুরগী খামারসহ সব্জি ও ফসল উৎপাদনে পুজি ও প্রযুক্তি দুটোই ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে কৃষির মূল ধারাটি ধাননির্ভর। বিগত শতকের ষাটের দশকে প্রচলিত ধানের বদলে উচ্চফলনশীল ইরিধান প্রচলনের মধ্য দিয়ে ধানচাষে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা শুরু হয়, সেচ, সার কীটনাশক ব্যবহারের পাশাপাশি ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ব্যবহৃত হতে থাকে। কিন্তু একে কোনভাবেই উন্নত দেশগুলোর কৃষির সাথে তুলনা করা যায় না। এই খাতে বেকারত্ব নেই বললেই চলে। তবে কৃষি শ্রমিকদের সংগঠিত করার কোন উদ্যোগ নেই। কৃষিজাত শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগটি সাম্প্রতিক।

ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশ শিল্প কারখানার দেশ হবার বদলে ইংল্যান্ডের শিল্প কারখানার কাচামালের যোগানদার হয়। বাংলাদেশের পাট, তূলা, নীল ডান্ডির পাটকল-কাপড় কলে চালান হয়। চাষীরা বাধ্য হয় ব্রিটিশ কারখানার কাচামাল উৎপন্ন করতে। অন্যদিকে ব্রিটিশরা এদেশে যেসব অবকাঠামো তৈরী করে তারও প্রধান উদ্দেশ্য থাকে ব্রিটেনে কাঁচামাল যোগান দেয়া। ব্রিটিশরা বিদায় হলে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটিতে শিল্পায়ন শুরু হয় পাকিস্তান সৃষ্টির বেশ পরে। কৃষিভিত্তিক পাটকল ছিলো এই অঞ্চলের প্রথম শিল্পখাত। কৃষিভিত্তিক চা শিল্পও বেশ বিস্তৃত হয়। এরপর টেক্সটাইল মিলসমূহ গড়ে উঠে। মেশিনারিজ কারখানার পাশাপাশি ছোট-খাটো ওয়ার্কশপও জন্ম নেয় আস্তে আস্তে। কসমেটিক্স এবং ভোক্তাসহ গৃহস্থালী পণ্য উপাদনের জন্য কিছু কারখানা তৈরী হয়। গড়ে উঠতে থাকে চামড়া ও পাদুকা শিল্প। কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, সার, চিনি ও সিমেন্টের বড় বড় শিল্পও প্রতিষ্ঠিত হয়। খুব সঙ্গতকারণেই এইসব কল-কারখানার মালিকেরা প্রায় সকলেই ছিলো হয় পাকিস্তান সরকার, নয়তো তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো এদের প্রতি। তৎকালীন বাঙ্গালী ধনিকরা বড়জোর পাটের গুদাম বা পাটসহ কৃষি ও ভোক্তাপণ্যেও ট্রেডিং-এর সাথে যুক্ত হতে পারতো। এই অঞ্চলের মানুষের না ছিলো শিল্প স্থাপনের পুজি, না ছিলো জ্ঞান। পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন প্রধানত এই অঞ্চলে শিল্পায়নের বিষয়টি দেখাশোনা করতো। এই সংস্থাগুলো কিছু সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানেরও জন্ম দেয়। এসবের ব্যবস্থাপনাও ছিলো তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। ফলে ব্রিটিশ শাসন এবং পাকিস্তানী শাসন কার্যত একটি ধারাবাহিকতায় পরিণত হয়। এসব কল-কারখানাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ধীরে ধীরে ছোট একটি শ্রমিক শ্রেণীও জন্ম নেয়। ক্রমশ শ্রমিক সংগঠনগুলো শক্তিশালী হতে থাকে। তাদের মাঝে বাম রাজনীতি ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রভাব তীব্র হতে থাকে। কম্যুনিস্ট, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী এবং প্রগতিশীল বাম রাজনৈতিক দলগুলো এইসব

শ্রমিকদের সংগঠিত করার উদ্যোগও নেয়। শ্রমিকরা এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করে। বিশেষ করে ৬২, ৬৬ ও ৬৯ সালে বাঙালী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিলো উল্লেখযোগ্য। অধুনা বন্ধ করা আদমজী জুট মিল এদেশের সর্ববৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিলো। সময়ের চাপে শুধু আদমজী নয় অন্যসব পাটকলও পাইকারী হারে বন্ধ হয়েছে। ফলে সেই সময়কার ক্ষুদ্র শ্রমিক শ্রেণীটিও বিলুপ্ত হয়েছে। এর বাইরে এখানে তাঁতশিল্প, মসলিন ইত্যাদি কাপড় শিল্প প্রথমে ব্রিটেনের ও পরে যন্ত্রের প্রতিযোগিতার জন্য ব্যাপক চাপের মুখে পড়ে।

একাত্তরের স্বাধীনতার পর পাকিস্তানী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সরকারী শিল্পখাতের জন্ম হয়। ব্যর্থ, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবস্থাপনা ও লুটপাটের জন্য সেইসব কল-কারখানা কার্যত সরকারের সম্পদের বদলে দায়ে পরিণত হয়। তবে বিগত প্রায় তিনযুগে বেসরকারী শিল্পখাতের বেশ বিকাশ ঘটে। প্রসাধন সামগ্রী, গৃহস্থালি-ভোক্তা পণ্য, গার্মেন্টস, গাড়ী ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য সংযোজন, কৃষিভিত্তিক খামার ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, সার, রসায়ন, আসবাবপত্র, প্লাস্টিক, কাপড়, সূতা, গার্মেন্টস সহায়ক, সিমেন্ট ইত্যাদি খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করে। তবে এখন বাংলাদেশের বৃহত্তম শিল্পখাতটি হলো গার্মেন্টস। দুর্ভাগ্যজনকভাবে গামেন্টসের শ্রমিকরা অমানবিক অবস্থায় বাস করে ও নির্মমভাবে শোষিত হয়। তারা যে ন্যুনতম মজুরী পায় তা জীবনধারণ তো দূরের কথা যাতায়াত ব্যয়ও হয় না। যদিও এই খাতে সর্বাধিক সংখ্যক নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে তথাপি ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার বঞ্চিত এই শ্রমিকরা সংগঠিতও নয়। ২০০৬ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনের সময় সরকার মালিকদের পক্ষে নগ্নভাবে অবস্থান নেয়। বিরোধীদলও গার্মেন্টস মালিকদের পক্ষেই অবস্থান নেয়। অতি সাম্প্রতিককালে দেশে কিছু আইসিটি সেবাখাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান জন্ম নিয়েছে যেগুলোকে আমরা জ্ঞানভিত্তিক শিল্প খাত বলতে পারি। তবে এসবের অবস্থা তেমন ভালো নয়। সার্বিকভাবে বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম বা সংগঠিত নয়।

২.৮ বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির অবস্থা: বাংলাদেশ গাঙ্গেয় পাললিক ভূমি হবার ফলে কৃষিক্ষেত্রে এর সফলতা অনেক। অতি ছোট একটি দেশে বিপুল সংখ্যক মানুষের বসবাস হওয়া স্বত্ত্বেও বাংলাদেশের মানুষ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিশেষত স্বাধীনতা উত্তরকালে কৃষকেরা বাংলাদেশে অসাধ্য সাধন করেছে। গার্মেন্টসেও আমরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। দেশে তেমনভাবে শিল্পায়ন না হলেও ভোক্তাপণ্য, সিমেন্ট লোহা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য কম নয়। যদিও বৃহৎ শিল্প গড়ে তুলতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি, তথাপি তথ্য প্রযুক্তি আমাদের ঘরে হানা দিয়েছে। বাংলাদেশে কম্পিউটার আসে ১৯৬৪ সালে, পরমাণু শক্তি কমিশনে।

এরপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার আসতে থাকে। সত্তুর দশকে শুরু হয় পিসির বাজারজাতকরণ। কিন্তু ১৯৮৬-৮৭ সালের আগে এই যন্ত্রের সাথে সাধারণ মানুষের তেমন কোন সম্পর্ক ছিলোনা। ১৯৮৬ সালের শেষ দিকে কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রয়োগের সাফল্য দেখানো হয়। ১৯৮৭ সালের ১৬ মে কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার করে সংবাদপত্র প্রকাশ করে মিডিয়া, মুদ্রণ ও প্রকাশনায় আমরা বিপ্লব করেছি। এই খাতে আমাদের সাফল্য ঈর্ষণীয়। বাংলাদেশের বই-পত্র-পত্রিকা দেখলে মনে হয়না যে, এটি কোন উন্নয়নশীল দেশের পণ্য। ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেটে কম্পিউটারের উপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার করার ফলে শহরাঞ্চলের শতকরা প্রায় ২০টি মধ্যবিত্ত পরিবারে কম্পিউটার ঢুকেছে। ১৯৯৭ সালে বিটিভিতে কম্পিউটার বিষয়ক অনুষ্ঠান চালু এবং তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচেষ্টায় এই বিষয়ে সচেতনতাও ব্যাপক। অবশ্য গ্রামের অবস্থা মোটেই তেমন নয়। শহর-গ্রামএবং ধনী-দরিদ্রের ডিজিটাল ডিভাইড এখানে অত্যন্ত তীব্র। ১৯৯৬ সাল থেকে স্কুলে এবং ১৯৯৮ সাল থেকে কলেজে কম্পিউটার বিষয়টি পাঠ্য হয়েছে। সরকার পরিকল্পনাবিহীন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে শহর-গ্রামের কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু কম্পিউটার সরবরাহ করেছে। কম্পিউটার উচ্চ শিক্ষায় পাঠ্য বিষয় হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। ব্যাংকিং খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার দিনে দিনে বাড়ছে।

দেশে এক দশকে মোবাইল ফোনের বিপ্লব হয়েছে। এটি কার্যত মানুষের জীবনযাপনের স্টাইল বদলে দিয়েছে। এই দেশটিতে এখন সাবমেরিন ক্যাবল লাইন সংযোগ আছে যা অন্তত আরো দুই দশকের চাহিদা মেটাতে পারে। যদিও তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের গতি অতি ধীর তথাপি তথ্যযুগে আমাদের প্রথম পদচারণা বেশ দৃঢ়। বাংলাদেশ থেকে সফটওয়্যার ও সেবার রপ্তানী বেড়েছে অনেক। আমার বিবেচনায় বাংলাদেশ এখন তথ্যযুগে প্রবেশের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। দিনে দিনে এখন খসে পড়ছে পুরানো ধ্যান-ধারনা। তবে অতীতের ধ্যান ধারণাগুলো খসে পড়ার পর নতুন একটি দুনিয়া গড়ে তোলার জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে।

২.৯ বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক সমাজের প্রসঙ্গকথা: বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা আমরাই প্রথম বলছিনা। সরকারীভাবে ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে জেনেভায় আয়োজিত বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তি সম্মেলনে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। কিন্তু তিনি সেই লক্ষ্যে কোন কাজ করেন নি। ২০০০ সালে প্রকাশিত সিরাজুল আলম খানের বই একুশ শতকের বাঙালী-এর ২০০৫ সালের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। সেই বইটিতেই তিনি এলভিন টফলারের থার্ড ওয়েবের কথাও উল্লেখ করেছেন। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তি সম্মেলনের প্রথম পর্বে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০০৬ সালের মাঝে বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা প্রদান করেন। ২০০৭ সালের ১২ জানুয়ারী ক্ষমতাসীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ফকরুদ্দিন আহমেদ গত ১লা ফেব্রুয়ারি ২০০৭ বাংলা একাডেমীর বইমেলা উদ্বোধনকালে বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "জাতির এই সংকটকালে সবচেয়ে বেশি জরুরি একটি ন্যায় ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা। আজ জ্ঞানের চেয়ে পেশি শক্তি, অসততা, কালো টাকার দাপট অনেক বেশি। কেউ কেউ কোন প্রকার জবাবদিহিতা ছাড়া অবৈধ সম্পদেও পাহাড় গড়ছে, কেউ রয়ে যাচ্ছে হতদরিদ্র। এই নৈরাজ্য, বৈষম্য চলতে দেয়া যায় না। সমাজের সর্বস্তরে তাই আজ

জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও ভারসাম্য নিশ্চিত করা জরুরি। এজন্য জনমনে সচেতনতা ও জনমত সৃষ্টি করাও সমান জরুরি। জ্ঞানী, গুণী, মেধাবী, যোগ্যদের সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার, সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরিবেশ তৈরিতে আমাদের সবাইকে তাই এগিয়ে আসতে হবে।" ১৫ মার্চ ২০০৭ মৌচাকে সৃজনশীল স্কাউট ক্যাম্পের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ একইভাবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।

গত ২৮ মার্চ ২০০৭ বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বেসিস-এর সফটএক্সপো ২০০৭ উদ্বোধনকালে ফকরুদ্দিন সরকারের উপদেষ্টা তপন চৌধুরীও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরীর আহ্বান জানান (সূত্র: দৈনিক জনকণ্ঠ ২৯ মার্চ ২০০৭)। একই সফটওয়্যার মেলায় গত ২৯ মার্চ ২০০৭ বেসিস আয়োজিত একটি গোলটেবিল বৈঠকে দেশ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদে তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছেন দেশের সকল স্তরের বিশিষ্ট জনেরা। এদের মাঝে আছেন আওয়ামী লীগের আবুল মাল আব্দুল মুহিত, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ মোজাফফর আহমেদ, বিএনপি নেতা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও মোফাজ্জল করিম, জাতীয় পার্টির আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এশিয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কান্ট্রি ডিরেক্টর হুয়া দু, এ্যামচেমের সাবেক সভাপতি আফতাবুল ইসলাম এবং বেসিসের সভাপতি সারোয়ার আলম এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। গোলটেবিল আলোচনায় এইমত প্রকাশ করা হয় যে, দুর্নীতি দমন করা গেলে আমাদের জাতীয় আয় তিন শতাংশ বাড়তে পারে। (সূত্র দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ মার্চ ২০০৭) ।

২.১০ একুশ শতকের ঠিকানা: একাত্তরে দেশ স্বাধীন করার যে স্বপ্নটা আমরা দেখেছিলাম তার বাস্তব রূপায়ন হলো এই দেশটির একুশ শতকের ঠিকানার সন্ধান করা। সেই ঠিকানাটি হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মধ্য দিয়ে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তখন এটি হবে সত্যিকারের জনতার বাংলাদেশ। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে আজকালের জন্য না হলেও আগামী ২০২১ সালে বাংলাদেশ যখন তার স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবে তখন এই দেশটিকে কি আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করতে

পারবো বা তখন আমাদের সমাজটি কি একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত হবে-এটি কি সত্যি সত্যি জনতার বাংলাদেশ হবে, এসব বিষয় নিয়ে আমাদেরকে এখনি ভাবতে হবে।

২.১১ স্বাভাবিক পরিবর্তন: যদি এমন হয় যে বাংলাদেশের কোন মহল থেকেই ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপান্তরে কোন চেষ্টা গ্রহণ করা হলোনা, তবুও এই দেশটি তার স্বাভাবিক পরিবর্তনের গতিতে-প্রধানত বিশ্বায়নের চাপ ও অভ্যন্তরীণ বিবর্তণের জন্য বদলে যাবে। তবে আমরা যা ভাবছি ২০২১ সালে বাংলাদেশ জ্ঞানভিত্তিক সমাজে পরিণত হবে-সেটি হবেনা। যেমন করে আমরা শিল্পযুগের ট্রেনটি মিস করেছি-তেমন করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে পৌছানোও আমাদের জন্য বিলম্বিত হবে। শিল্পযুগের ট্রেন মিস করার সময় আমরা পরাধীন ছিলাম-এটি একটি সান্ত্বনা হলেও, তথ্যযুগে পৌছানোর সকল সুযোগ থাকার পরও আমরা যদি যেতে না পারি, তবে কোন সান্ত্বনাও খোঁজে পাওয়া যাবেনা।

২.১২ উন্নত-অনুন্নত ও উল্লম্ফন: শিল্পোন্নত দেশ যেমন আমেরিকা, ইউরোপ এখন শিল্পভিত্তিক সমাজ থেকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে উত্তরণের লড়াই করছে। কিন্তু আমাদের কৃষিযুগ থেকেই উত্তরণ হয়নি। ফলে আমাদেরকে শিল্পযুগের সিড়িটি জাম্প করে পার হতে হবে। যদিও স্বাধীনতার পর বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে আমাদের বেশ কিছুটা শিল্পায়ন হয়েছে তথাপি আমাদের সমাজের অন্তর্নিহিত চরিত্র কৃষি যুগের। এর চরিত্র অনুন্নত পুঁজিবাদের। এটি এক ধরনের অক্ষমতা-রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যর্থ হবার জন্য আমাদের ট্রান্সফর্মেশনটা হয়নি। পরাধীনতার জন্যও আমরা প্রায় আড়াইশো বছর সময় হাতছাড়া করতে বাধ্য হয়েছি, যখন দুনিয়া জোড়া শিল্পবিপ্লব হয়েছে। এজন্য আমরা লোহালক্কড়ভিত্তিক শিল্পায়নের বদলে নলেজবেজড ইন্ডাষ্ট্রি তৈরি করবো। সাধারণ কায়িক শ্রমিক তৈরির বদলে আমরা তৈরি করবো জ্ঞানকর্মী। আমাদের অর্থনীতিতে সর্বাধিক অগ্রাধিকার থাকবে মেধার। সুখের বিষয় হলো নলেজবেজড সোসাইটির কাজটি এখনো শিল্পোন্নত দেশগুলো শুরু করেছে মাত্র। আমরা যদি এখনি তাদের চাইতে

একটু বেশী গতিতে আমাদের সার্বিক অবস্থাটি বদলাতে পারি তবে তাদের সাথে আমাদের খুব একটা দূরত্ব থাকবে না।

৩. দু হাজার একুশ সালের বাংলাদেশ: বাংলাদেশে বিদ্যমান এগারোই জানুয়ারী উত্তর সার্বিক পরিস্থিতি, রাজনীতিসহ সকল বিষয়ে এর প্রভাব এবং সারা দুনিয়ার পরিবর্তনের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আমি এমন একটি বাংলাদেশের কথা ভাবছি যার অবয়বটা এখনো অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। খুব সংক্ষেপে আমি সেই বাংলাদেশটির বিবরণ দিতে চাই-ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচী বাস্তবায়নের পর যেমনটি এই দেশটি হতে পারে।

স্বপ্ন এক ॥ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ: স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সমাজে জ্ঞানই শক্তির কেন্দ্র বলে অর্থের-বিত্তের চাইতে জ্ঞানের প্রভাব বেশী থাকবে। এই সময়ে রাষ্ট্রের কাঠামোর একটি বিশাল পরিবর্তন হবে। সমাজে জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা সম্মানিত হবেন। অর্থনীতি জ্ঞানভিত্তিক বলে মেধাভিত্তিক শিল্প-কারখানার প্রসার বেশী হবে। বস্তুগত সম্পদের চাইতে মেধাজাত সম্পদ সৃষ্টির প্রতি সকলের বেশী আগ্রহ থাকবে। মেধার বিকাশ, সংরক্ষণ ও সৃজনশীলতাই হবে নীতি ও নৈতিকতার কেন্দ্র। দেশে-বিদেশে জ্ঞানভিত্তিক শিল্পের বিশাল বাজার সৃষ্টি হবে। প্রচলিত কৃষি-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তথা মেধার স্পর্শে মূল্য সংযোজন এমনভাবে হবে যে বস্তুগত মূল্যের চাইতে মেধাজাত মূল্য সংযোজন অনেক বেশী হবে। নারী ও তরুণরা এইসব কাজে সবেচয়ে বেশী সক্রিয় থাকবে। বয়স্করা প্রধানত অভিভাবকত্ব এবং অবসর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন। আগামী চৌদ্দ বছরে নতুন একদল জ্ঞানকর্মী তৈরী হবে। এই জ্ঞানকর্মীরা সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র নেতৃত্ব দেবে। এরা সংখ্যায় বেশী বলে সাধারণভাবে বাংলাদেশের একুশ শতকের ইতিহাস তারাই রচনা করবে। অর্থনীতি হবে চাঙ্গা। দুই ডিজিটের নীচে প্রবৃদ্ধি হবেনা। বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের অপবাদ ঘুচবে। নিজেদের অর্থ দিয়ে আমরা আমাদের উন্নয়ন করছি। দাতারা আমাদের জন্য প্রেসক্রিপশন দিচ্ছে না। বরং আমরা দুনিয়াকে দেখিয়ে দিচ্ছি জ্ঞানভিত্তিক সমাজের রূপরেখা কেমন।

স্বপ্ন দুই ॥ ডিজিটাল বাংলাদেশ: আমরা স্বপ্ন দেখি, পুরো দেশে দারিদ্র সীমার নীচে কোন মানুষ বসবাস করবেনা। দেশে স্বচ্ছল মানুষ সবাই। সমাজে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক-এমন খুব ধনী কোন মানুষ বা পরিবার নেই। বড় বড় শিল্প-কল-কারখানা থাকবে। তবে এসব কারখানার শেয়ার হোল্ডাররা থাকবে জনগণ। দেশে পুঁজির বিকাশ ঘটবে। তবে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার জন্য ধনী আরো ধনী হবার সুযোগ পাবেনা। মাঝারি আয়ের মধ্যবিত্তের সংখ্যাই অধিক। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা কোনটাই কোন মানুষের সংকট নয়। সবাই তার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারে। অন্নের অভাবে পড়েনা কোন মানুষ। সারা দেশে নেই কোন বস্ত্রহীন মানুষ। ছিন্নমূল বাসস্থানহীন কোন মানুষ পাওয়া যায়না। রাস্তায় ভিক্ষুক পাওয়া যায়না। সরকারী-খাস জমি, ফুটপাত, রেল স্টেশন, লঞ্চ ঘাট বা অন্য কোথাও ঝুপড়ি ঘরের বস্তিতে কেউ থাকেনা। নিজের হোক, ভাড়ায় হোক একটি নিরাপদ আবাস প্রতিটি মানুষের থাকবে। প্রতিটি মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেবা পাওয়া যায়। বিণা চিকিৎসায় মরেনা কেউ। প্রতিটি মানুষের জন্য ডাক্তার-হাসপাতাল-ঔষধ পাওয়া যায়। গ্রামের হোক আর শহরের হোক ন্যূনতম চিকিৎসার ব্যবস্থা সকলের জন্যই আছে। সরকার সেই চিকিৎসা নিশ্চিত করে।

প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সে পেতে পারে। এমনকি দেশের বাইরের বিশেষজ্ঞদের কাছে একজন সাধারণ মানুষকে পৌছানোর ব্যবস্থা করে সরকার। সরকার গ্যাস, পানি-বিদ্যুৎ, পয়ঃ নিস্কাষণসহ সব সাধারণ সেবাই মানুষের জন্য প্রদান করে। প্রতিটি মানুষের জন্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে এবং সরকার সেই শিক্ষা প্রদান করবে। শিক্ষার ন্যূনতম এই স্তরটিতে কোন বৈষম্য থাকবেনা। শহর-গ্রাম, ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকলের জন্য ন্যূনতম শিক্ষার একটিই ধারা প্রবাহমান থাকবে। দেশের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর নিজের কম্পিউটার আছে। নিরাপত্তার অভাব নেই কারো। তার নিজের জীবন নিয়ে কোন ভয় নেই। সে ভয়লেশহীনভাবে দেশের যেকোন প্রান্তে যেকোন সময় চলতে পারে। তার মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত। দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নেই। দেশে স্বাধীন

বিচার বিভাগ আছে। আছে আইনের শাসন। রাজনীতি নষ্টামিতে ভরা নয়। দুর্বৃত্তায়ন নেই। নেই লুটেরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি। মানুষ রাজনীতিবিদদের চোর-মহাচোর বলেনা, সম্মানের চোখে দেখে। রাজনীতিবিদদের দেশপ্রেমিক বলে মনে করা হয়। দেশে একটি সচেতন নাগরিক সমাজ দেশবাসীর সকল ধরনের বিষয়াদিসহ মানবাধিকারের বিষয়সমূহও মনিটর করে। সংবিধানে প্রদত্ত নিয়ম কাঠামোর মাঝে সংবাদপত্রের-মিডিয়ার স্বাধীনতাসহ মৌলিক অধিকার পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়ে আছে। মানুষ ঢাকা শহরের সরকারের কাছে আসেনা, সরকার যায় তার গ্রামের বাড়ীতে। সে নিজে সিদ্ধান্ত নেয় কোথায় তার উন্নয়ন হবে। তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সরকার দক্ষ ও জনগণের সেবক। সরকারের সকল তথ্য নাগরিকেরা যে কোন স্থান থেকে জানতে পারে। বিচার হোক আর সরকারের কাছে কোন আবেদন হোক, কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন দিয়েই নাগরিকেরা সরকারের কাছে পৌঁছাতে পারে। কাউকে সশরীরে সরকারী অফিসে আসতে হয়না। জাতীয় সংসদের সদস্যরা গম বিলি, টিন আত্মসাৎ, মামলাবাজি, দলবাজি, কমিশনবাজি এসব করেন না। তাদের হ্যামার-জাগোয়ার-মার্সিডিজ বেঞ্জ থাকে না। শহরের পাতাল-আকাশ রেল তাদের চলাচলের উপায়। এক শহর থেকে অন্য শহরে যাবার জন্য তারা ট্রেনে চড়ে বা রেলে উঠে। তারা দেশের জন্য একুশ শতকের আইন প্রণয়ন এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় মানুষের করণীয় বিষয়াদি নিয়ে কাজ করেন। প্রশাসনে স্পীড মানির প্রয়োজন নেই। কাজ হয় আপন গতিতে। পুলিশ এসএমএস বা ই-মেইলে মামলা গ্রহণ করে। বিচারক প্রয়োজনে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর সহায়তা নিয়ে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারেন।

আইন-বিচার কার্যক্রম, আইনের ব্যাখ্যা, আদালত, উকিল এবং বাদি-বিবাদী সকলের কাছেই ঘরে বসে পাবার মতো সহজলভ্য থাকবে। আমাদের স্বপ্নের মাঝে থাকতে পারে দেশের নদীগুলো মিষ্টি পানি আর সুস্বাদু মাছে পরিপূর্ণ। এসব নদী-খাল দিয়ে আরামদায়ক দ্রুতগতির নৌযান চলে। সড়কপথগুলো প্রশস্ত, নিরাপদ ও আরামদায়ক গণবাহনে ভরা। শহরে পাতাল-আকাশ রেল। পদ্মা সেতু ততোদিনে শেষ হয়ে যাবে।

শীতলক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া, যমুনায় আরো সেতু হবে। রেললাইন যাবে টেকনাফ। আমি স্বপ্ন দেখতে চাই যে, দেশের দুই কোটি শিক্ষিত বেকার নিজেদেরকে একুশ শতকের উপযুক্ত করবে এবং তাদের বেকারত্ব ঘুচবে। নতুন যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বের হবে তারা তৈরী হবে জ্ঞানকর্মী হিসেবে।

লেখক তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, ঔপন্যাসিক, দেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস আবাস-এর চেয়ারম্যান- সাংবাদিক, কম্পিউটার বিষয়ক বই-পত্র ও নিবন্ধের লেখক ও কলামিস্ট এবং বিজয় কীবোর্ড ও সফটওয়্যার এর জনক ॥ ই-মেইলঃmustafajabbar@gmail.com,ওয়েবপেজঃ www.bijoyekushe.net

বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানীঃ জামাল নজরুল ইসলাম

শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী

'ছোট দেশের বড় বিজ্ঞানী' হিসেবে পরিচিত অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম একজন গাণিতিক বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ববিদ। মহাবিশ্বের উদ্ভব ও পরিণতি সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি বিশেষভাবে খ্যাত। এছাড়াও তিনি বেশ কিছু গাণিতিক সূত্র ও জটিল গাণিতিক তত্ত্বের সহজ পন্থার উদ্ভাবকও বটে। নিখাদ দেশপ্রেমের কারণেই কেমব্রিজের সোয়া লক্ষ টাকা বেতনের অধ্যাপনা ছেড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদালয়ে মাত্র তিন হাজার টাকার বেতনের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীকালে সেখানেই গড়ে তোলেন বিশ্বমানের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। শুধু কৃতী ছাত্রই নয়, আদর্শ মানুষ গড়ে তোলাও ছিল তাঁর স্বপ্ন।

১৯৩৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারির ঝিনাইদহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সেই সময় ঝিনাইদহের মুন্সেফ ছিলেন। ঝিনাইদহে জন্ম হলেও আদতে তাঁদের পূর্বপুরুষের ঠিকানা ও আবাসস্থল ছিল চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার নারায়ণ হাট ইউনিয়নের মহানগর গ্রমে।
তাঁর বাবা খান বাহাদুর মুহম্মদ সিাজুল ইসলাম এবং মা রাহাত আরা বেগম। বাবা অবিভক্ত বাংলার ভারপ্রাপ্ত আইন সচিব ছিলেন। ব্রিটিশদের নিকট থেকে তিনি 'খান বাহাদুর' উপাধিটি পেয়েছিলেন। মা রাহাত আরা বেগম ছিলেন উর্দু ভাষার কবি, যিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটকটি সফলভাবে উর্দুতে অনুবাদ করে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। কলকাতায় তাঁদের বাসায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের যাতায়াত ছিল। কাজী নজরুল ইসলামের নামের সঙ্গে মিল রেখেই তাঁর বাবা ও মা ছেলের নাম রাখেন

'জামাল নজরুল ইসলাম'। শৈশবের প্রথমে কলকাতার একটি মডেল স্কুলে ভর্তি করা হয় তাঁকে। এরপর তিনি ভর্তি হন কলকাতারই শিশু বিদ্যাপীঠে। কিছুদিন শিশু বিদ্যাপীঠে পড়ার পর খুব একটা ভালো না লাগায় আবার ফিরে গেলেন মডেল স্কুলে। এখানে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন তিনি। এরপর পরিবারের সঙ্গে চট্টগ্রামে এসে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন।

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বালক জামাল নজরুলের অসাধারণ মেধার পরিচয় পেয়ে তাঁকে ডাবল প্রমোশন দিয়ে সরাসরি ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি করে নেন। নবম শ্রেণি পর্যন্ত তিনি এই স্কুলেই শিক্ষালাভ করেন। এ সময় তিনি নিজে নিজেই গণিত বইয়ের অনুশীলনীর জ্যামিতি করতে পছন্দ করতেন। এ কারণে তখনই অনেকের নজর কাড়তে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় 'বিশ্ব পরিচয়' বইটি পড়ে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। নবম শ্রেণীতে উঠে তিনি সরাসরি চলে যান পশ্চিম পাকিস্তানের মারিতে। সেখানে থাকতেন তাঁর বড় ভাইসহ ভগ্নিপতিরা। ভর্তি হন পাকিস্তানের ব্রিটিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লরেন্স কলেজে। এটি ছিল পাকিস্তানের সম্পূর্ণ আবাসিক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখান থেকে তিনি সিনিয়র কেমব্রিক ও হায়ার সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন যা বর্তমানে ও-লেভেল এবং এ-লেভেল পরীক্ষার সমতুল্য। সে সময় ওখানে মেট্রিকুলেশন বা এখনকার সময়ের এসএসসি পরীক্ষা ছিল না। মেট্রিকুরেশনকে বলা হতো সিনিয়র কেমব্রিজ যা বর্তমান সময়ের ও-লেভেলের সমতুল্য। সেই কলেজে হায়ার সিনিয়র কেমব্রিজে অ্যাডভান্স গণিত নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন একমাত্র তিনিই।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হায়ার সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সোজা চলে যান কলকাতায় উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য। ভর্তি হন কলকাতার বিখ্যাত সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে, যে কলেজে এক সময় পড়াশোনা করেছিলেন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। সেই কলেজ থেকেই তিনি কৃতিত্বের সাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএসসি (সম্মান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এরপর তাঁর শিক্ষাজীবনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তিনি ভর্তি হলেন কেমব্রিজের মতো বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন বসে তাঁর বিখ্যাত 'প্রিন্সপিয়া' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। সেই মহাগ্রন্থে বিধৃত হয়েছিল নিউটনের 'মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব', যে তত্ত্ব দিয়েই বিজ্ঞানীরা সৌরজগৎসহ তারকামন্ডলের আকর্ষণ ও বিকর্ষণজনিত আবর্তনের ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে সেই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে অধ্যাপক ইসলাম দ্বিতীয়বারের মতো বিএসসি (সম্মান) কোর্সে ভর্তি হলেন। সেখান থেকে ১৯৫৯ সালে তিনি গণিতে ট্রাইপস পার্ট-টুতে দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ১৯৬০ সালে একই বিষয়ে ট্রাইপস পার্ট-থ্রিতে ডিস্ট্রিংশনসহ সম্মান ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে রোজ বেল রচনা প্রতিযোগিতায় 'Unified Field Theories' (একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব) ওপর প্রবন্ধ লিখে তিনি কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের 'রোজ বল ম্যাথমেটিক্যাল পুরস্কার' লাভ করেন।

১৯৬০ সালে তিনি 'ট্রাইপস পার্ট-থ্রি স্কলারশিপ'সহ 'ট্রিনিটি কলেজের সিনিয়র স্কলার' মনোনীত হন। ১৯৬০ সালেই তিনি আবার রিসার্চ স্কলার হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়োগিক গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি (ডক্টর অব ফিলোসফি) ডিগ্রি লাভ করেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ সালে ডিএসসি (ডক্টর অব সায়েন্স) ডিগ্রিতে ভূষিত হন। বর্ণাঢ্য শিক্ষা জীবন শেষে অধ্যাপক ইসলাম গবেষণা ও কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। শুরু হয় তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়।

তাঁর গবেষণা জীবন শুরু হয় বিশ্বের সব নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। তাঁর গবেষণার সূতিকাগার কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে। তারপর তিনি ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আমেরিকার মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান' বিভাগে পোস্ট-ডক্টরাল (পিএইচডি উত্তর) ফেলো হিসেবে গবেষণা করেন। পরে ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৬, এক বছরের জন্য তিনি লন্ডনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো নিযুক্ত হন। এরপর ১৯৬৭ থেকে

১৯৭১ সাল পর্যন্ত মোট চার বছর তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট'-এর স্টাফ মেম্বার ছিলেন। সেখানেই পরিচয় হয় স্টিফেন হকিং-এর মতো বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীর সঙ্গে। ফলে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। ১৯৭১ থেকে ১৯৭২, এই এক বছর তিনি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ভিজিটিং অ্যাসোসিয়েট এবং আরো এক বছর (১৯৭২-৭৩) আমেরিকারই ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের 'সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট' ছিলেন। এরপর কর্মজীবনের শুরু।

অধ্যাপক ইসলাম ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত লন্ডনের কিংস কলেজে ফলিত গণিতের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সায়েন্স রিসার্চ ফেলো এবং ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত লন্ডনের সিটি ইউনিভার্সিটিতে প্রথমে প্রভাষক ও পরে রিডার (বর্তমানের সহযোগী অধ্যাপক পদের সমমানের) পদে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি ১৯৬৮, ১৯৭৩ ও ১৯৮৪ সালে আমেরিকার প্রিন্সটনে ইন্সটিটিউট ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজের ভিজিটিং মেম্বার ছিলেন যেখানে এক সময় আইস্টাইন ও কর্মরত ছিলেন।

অধ্যাপক ইসলাম ১৯৬৪ সালে 'কণা পদার্থবিজ্ঞান' (পার্টিকেল ফিজিক্স)-এর ওপর পিএইচডি করেন। তাঁর পিএইচডি, থিসিসের শিরোনাম ছিল–'অ্যানালিটিক প্রোপার্টিস অব এস-মেট্রিক্স এলিমেন্টস' (Analytic Properties of S-Matrix Elements)। তাঁর প্রকাশিত গবেষণাপত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে তিনি যে গবেষণাপত্র গুলো প্রকাশ করেন সেগুলো কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্পর্কিত। ১৯৬৬ সালের পর থেকে তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব ও বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের ওপর কাজগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে থাকে। সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বে আইনস্টাইনের বিখ্যাত মহাকর্ষীয় সমীকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। এই সমীকরণের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে আধুনিক

বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব। কিন্তু এই সমীকরণের প্রকৃত সমাধান আজও পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক ইসলাম সারা জীবন এই সমীকরণের প্রকৃত সমাধান খুঁজে বেরিয়েছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সমাধান করতে না পারলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন।

১৯৭৭ সালে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের ওপর গবেষণা করে তিনি 'পসিবল আল্টিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স' শীর্ষক একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করে। প্রবন্ধটি লন্ডনের বিখ্যাত রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধের সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে (১৯৮৩ সালে) তিনি রচনা করেন বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য আল্টিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স'। তাঁর গবেষণার আরেকটি উলেখযোগ্য দিক হলো 'অ রোটেটিং চার্জড ডাস্ট ইন জেনারেল রিলেটিভিটি' শীর্ষক লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির মতো প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রসিডিংস-এ ধারাবাহিকভাবে পরপর ৬টি গবেষণাপত্র প্রকাশ। এ কাজের জন্য ১৯৮২ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ইসলামকে অত্যন্ত বিরল ডিএসসি ডিগ্রিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে ওই একই কাজের ওপর ভিত্তি করেই তিনি 'রোটেটিং ফিল্ডস ইন জেনারেল রিলেটিভিটি'র মতো গবেষণাধর্মী একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা ১৯৮৫ সালে কেমব্রিজ ইউনির্ভাসিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।অধ্যাপক ইসলাম তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে মোট ৮টি গ্রন্থ রচনা করেন। যার মধ্যে ৪টি গ্রন্থই বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছে। এছাড়াও তিনি ৭০টির মতো মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র রচনা করেন। যেগুলোর বেশিরভাগই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জার্ণালে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬২ সালে 'জার্নাল অব ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্স'-এ তাঁর প্রথম মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আইস্টাইনের জন্মশতবর্ষে, অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে আমেরিকার 'সকাই অ্যান্ড টেলিস্কোপ' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় তাঁর বহুল আলোচিত 'দ্য আল্টিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি। পরবর্তীকালে একই শিরোনামে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেস থেকে ১৯৮৩ সালে প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিই তাঁকে খ্যাতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়। পৃথিবীর সব বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে এই গ্রন্থটি পাঠ্যবই হিসাবে পড়ানো হয়। গ্রন্থটি ফরাসী, ইতালিয়ান, পর্তুগীজ, সার্বোক্রোয়াট (পূর্বতন

যুগোশাভিয়া) ও জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত গ্রন্থটি আমাদের প্রিয় মাতৃভাষায় অনূদিত হয়নি।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহঃ

১. দ্য আল্টিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স', কেমব্রিজ প্রেস, লন্ডন, ১৯৮৩ (ডিজিটাল প্রিন্টিং ২০০৯)
২. ক্ল্যাসিক্যাল জেনারেল রিলেটিভিটি, সহ-সম্পাদক ডব্লিউ বি বনর এবং এম এ এইচ ম্যাককুলাম-এর সাথে, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন, ১৯৮৪।
৩. রোটেটির্ং ফিল্ডস ইন জেনারেল রিলেটিভিটি, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন, ১৯৮৫ (ডিজিটাল প্রিন্টিং ২০০৯)
৪. প্রসিডিংস অব দ্য ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্স, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭।
৫. অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যাথমেটিক্যাল কসমোলজি, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন, ১৯৯২ (দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২)
৬. কৃষ্ণ বিবর, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
৭. মাতৃভাষা ও বিজ্ঞানচর্চা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ, রাহা-সিরাজ প্রকাশনা (সাবযা-যার, ২৮ সার্সন রোড), চট্টগ্রাম, ১৯৯৭।
৮. শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ, রাহা-সিরাজ প্রকাশনা (সাবযা-যার, ২৮ সার্সন রোড, চট্টগ্রাম, ১৯৯৮

বহুল আলোচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসমূহঃ

১. 'পসিবল দ্য আল্টিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স', কোয়াটারলি জার্নাল অব দ্য রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি, ১৩, ৩ (১৯৭৭) ।
২. দ্য আল্টিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স', স্কাই অ্যান্ড টেলিসকোপ (যুক্তরাষ্ট্র) জানুয়ারি ১৯৭৯।
৩. দ্য লং-টার্ম ফিউচার অব দ্য ইউনিভার্স', ভিসটাস ইন অ্যাস্ট্রোনমি, খন্ড-২৩, নং-৩, পৃ. ২৬৫, ১৯৭৯।
৪. 'দ্য ফার ফিউচর অব দ্য ইউনিভার্স', এনডেভার (অক্সফোর্ড, ইংল্যান্ড) মার্চ ১৯৮৪।

১৯৭৭ সালে রচিত অধ্যাপক ইসলামের বহুল আলোচিত জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি সম্পর্কে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসন তাঁর 'ট্রাইম উইদাউট এন্ড: ফিজিক্স অ্যান্ড বায়োলজি ইন ওপেন ইউনিভার্স-এ লিখেছেন, I am particularly indebted to Jamal Islam for an early draft of his 1977 paper, which started me thinking seriously about the remote future'. অধ্যাপক ইসলাম রচিত 'দ্য আল্টিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স' (১৯৮৩) বিখ্যাত গ্রন্থের পর তাঁর আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো 'অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যাথমেটিক্যাল কসমোলজি'। এটি ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটিরই গাণিতিক সংস্করণ। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এ গ্রন্থটির প্রাসঙ্গিকতা এতোই বেশি যে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়েছে।

অধ্যাপক ইসলাম রচিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'কৃষ্ণ বিবর' (ব্যাক হোল) যা ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। সুন্দর বাংলায় অত্যন্ত সংক্ষেপে এ গ্রন্থে লেখক কৃষ্ণ বিবরের প্রকৃতি বাঙালি পাঠক সমাজের জন্য সহজ ভাষায় রচনা করেছেন। কৃষ্ণ বিবর নিয়ে অধ্যাপক ইসলাম আগ্রহী ছিলেন এই কারণে যে 'অনাগত ভবিষ্যতে বিশ্বের কী অবস্থা হবে এবং কী ঘটনা ঘটবে এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ব্যাপারে কৃষ্ণ বিবরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।'

১৯৮৪ সালে তিনি চূড়ান্তভাবে দেশে ফিরে এসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগ দেন এবং পরবর্তীকালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর তাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্র–গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার পরিচালক, ইউজিসি প্রফেসর ও প্রফেসর ইমেরিটাস হিসেবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গবেষণা ও কর্মজীবন অতিবাহিত করেন।

দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি দূর পরবাসে কাটালেও দেশ, দেশের মাটি ও মানুষকে কখনো ভুলেননি। তাই তো আমরা দেখি স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি কলমসৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। চিঠি লিখেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ট্রিনিটি কলেজের লর্ড বাটলারসহ চীনের

প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই-কে। এখানেই তাঁর দেশপ্রেমের আরেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অধ্যাপক ইসলাম দেশ-বিদেশে বহু বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান ও সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন এবং নিজ দেশের হয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

দেশ-বিদেশে বিভিন্ন পুরস্কারেও তিনি ভূষিত হন। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী কর্তৃক স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পদক' ও বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক জ্যোর্তিবিজ্ঞান চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য 'ব্রুনো পদক' লাভ করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি ইতালির আবদুস সালাম সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের থার্ড ওয়ার্ল্ড একাডেমীর লেকচার পদক লাভ করেন। তিনি ২০০০ সালে কাজী মাহবুবউলাহ ও জেবুন্নেছা পদক পান। বাংলাদেশ সরকার তাকে ২০০১ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে একুশে পদকে ভূষিত করেন। ২০০৮ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সম্মানসূচক ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করেন। ২০১১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের 'রাজ্জাক-মামসুন আজীবন সম্মাননা পদক' লাভ করেন। তিনি দেশ-বিদেশের অনেক খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। 'থার্ড ওয়ার্ল্ড একাডেমী অব সায়েন্সেস, 'কেমব্রিজ ফিলসফিক্যাল সোসাইটি', ইতালির 'আবদুস সালাম ইন্টালন্যাশনাল সেন্টার ফল থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স', 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী', 'ইসলামিক একাডেমী অফ সায়েন্সেস' ও 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ'-এর সম্মানিত সদস্য ছিলেন। আজীবন সদস্য ছিলেন কেমব্রিজের ক্লেয়ার হলের। এছাড়াও তিনি দেশের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ও পরিবেশবাদী সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

অধ্যাপক ইসলাম শিল্প-সাহিত্য ও সংগীতচর্চার মধ্য দিয়েই বড় হয়েছেন। বাবা শৈশবেই গণিত ও সংগীতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁর মা রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি ও অতুলপ্রসাদের গান গাইতেন। যার ফলে ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি তার একটা প্রবল আর্কষণ ছিল।

তিনি একাধারে সেতারশিল্পী, কণ্ঠসংগীত শিল্পী সর্বোপরি পিয়ানো বাজানোয় পারদর্শী একজন ব্যতিক্রম শিল্পী ও সমঝদার। স্বাভাবিক সুকণ্ঠের অধিকারী অধ্যাপক ইসলাম গাইতে পারতেন রবীন্দ্রসংগীত, মো. রফি, কে এল সায়গল ও হেমন্তের বিখ্যাত গানগুলো। শিল্পকলার প্রতিও ছিল তার প্রবল আগ্রহ। তাঁর বাসার দোতলায় খাবার ঘর থেকে শুরু করে বসার ঘর পর্যন্ত দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলো দেকলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জীবিত অবস্থায় তাঁর সর্বশেষ জন্মদিন (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩) অর্থাৎ ৭৪তম জন্মদিন পালন করেছিলেন তঁর প্রিয় সংগীত সংগঠন চট্টগ্রামের 'সদারঙ্গ'। সেদিন সদাহাস্যময়, প্রাণোচ্ছল ও সুদর্শন মানুষটি প্রায় দশ মিনিট বক্তব্য রাখার পর নিজেই টেনে নিয়েছিলেন হারমোনিয়ামটা, তারপর তিনি গাইলেন, 'কোন এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোন' এ গানটি।

২০১৩ সালের ১৬ মার্চ তিনি এ পৃথিবী ছেড়ে পরপারে চলে যান। মাত্র ৭৪ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। 'মাত্র' বললাম এ কারণে, তিনি এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, ৭৪ বছর বয়সে বার্ট্রান্ড রাসেল একবার প্লেন থেকে পানিতে পড়ে গিয়েছিলেন এবং সাঁতার কেটে তীরে উঠেন। এরপর তিনি বেঁচে ছিলেন আরো ২৪ বছর। আর এই সময়ে তিনি বই লিখেন ২৪টি। আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা দেখি, অধ্যাপক ইসলাম কাততালীয়ভাবে ওই ৭৪ বছর বয়সেই চলে গেলে। তিনি যদি বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো আরো ২৪ বছর বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনিও হয়তো ২৪টি বই লিখতে পারতেন। যে স্বপ্ন নিয়ে এথেন্স নগরীর পাশে প্লেটো যে একাডেমি স্থাপন করেছিলেন তাঁর আড়াই হাজার বছর পর বাংলার এক কাজপাগল বিজ্ঞানী অনুরূপ একাডেমি স্থাপন করে, সেই একই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে সদা ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর গবেষণা কেন্দ্রের দোতলা ঘরের একটি কক্ষে ধ্যানমগ্ন এই শেকড়সন্ধানী জ্ঞানতাপস বিজ্ঞানী অধ্যাপক ইসলামের জ্ঞানচর্চা এথেন্সের সেই দার্শনিককেই স্মরণ করিয়ে দেয়, যাঁর কাছ থেকে যুগ যুগ ধরে মানুষ জ্ঞানের প্রথম পাঠ নিয়েছে।

শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী
জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১।

পৃথিবীর বিকর্ষণ বল ও বস্তুর নিম্নমুখী পতনের কারণ

ডাঃ মোঃ আক্কাস উদ্দীন

পৃথিবীর বিকর্ষণ বল সম্পর্কে জানার আগে আমাদের জানতে হবে পৃথিবী কেন আকর্ষণ করে? পৃথিবী কি চুম্বক? কেনই বা পৃথিবীর উপরের বৃন্তচ্যুত আপেল উপরের বিশাল ফাঁকা শূন্য স্থান থাকা সত্ত্বেও নিচের দিকে পড়ে? আজ থেকে প্রায় ৩৪৯ বছর আগে ১৬৬৫ সালে বিজ্ঞানী নিউটন লিংন শায়ারের একটি খামারে অবস্থান করছিলেন। একদিন তিনি গাছ থেকে একটি আপেলের নিম্নমুখী পতনের দৃশ্য দেখে চিন্তায় পড়ে গেলেন। এ জিজ্ঞাসার সমাধান বের করতে যেয়ে তিনি আবিষ্কার করেন অভিকর্ষ তত্ত্ব।

অভিকর্ষ এক প্রকার আকর্ষণ বল। নিউটনের ধারণা ছিল পৃথিবীর আকর্ষণেই উপরের বৃন্তচ্যুত আপেলটি নিচের দিকে পড়েছে। এটি আদৌ ঠিক কিনা তা আমরা কখনো ভেবে দেখিনি। আমরা নিউটন যা বলেছেন তা মেনে নিয়ে বসে আছি এবং পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রে একে অপরকে আকর্ষণ করে তার উত্তরও আমরা খুঁজে দেখিনি। আমরা শুধু জানি একটি কণা অপর একটি কণাকে আকর্ষণ করে। এদের আকর্ষণ বলের পরিমাণ উভয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক ও তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক। অর্থাৎ $F=G(m1 \times m2)/d2$। অনন্য সাধারণ প্রতিভাধর বিজ্ঞনী নিউটন বস্তু ও গ্রহ, নক্ষত্র একে অপরকে আকর্ষণ করে এ কথা বললেও বস্তু কেন আকর্ষণ করে, এর জবাব তিনি দিতে পারেননি। বরং তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন। "এ পর্যন্ত ঘটনা থেকে অভিকর্ষের কারণ আমি আবিস্কার করতে পারিনি এবং তাই আমি কোন অনুমানের আশ্রয় নেব না। পরীক্ষা দর্শন শাস্ত্রে অনুমানের স্থান নেই।' এরপরও তিনি ধারণা করতেন অভিকর্ষ একটি রহস্যজনক শক্তি। যা বহিরাগত প্রভাব বলে জ্যামিতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

কিন্তু নিউটন এ কথা বললেও কণাগুলো কেন আকর্ষণ করে, এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজছেন অনেক মণিষীগণ। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের ধারণা ছিল অভিকর্ষ হলো স্থান কালের একত্রীকরণের একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র। রহস্যময় অভিকর্ষ বলে কিছু নেই। এটি কেবল স্থান কালের গঠন। তিনি একত্রীভূত স্থান কালের ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রমাণ করেন সে নিউটনীয় অভিকর্ষ স্থান-কালের একত্রীকরণের একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তিনি জড়ত্বজনিত আধান আর অভিকর্ষ জনিত আধান সম্পূর্ণ সমান মনে করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি ধরে নিয়ে ছিলেন যে, মহাকর্ষ তরঙ্গ বা গ্যাভিটন নামের এক ধরনের বিশেষ কণা বা কোয়ান্টাম আছে যার জন্য বস্তু আকর্ষণ করে। আলোর বেগে গমনকরী মহাকর্ষীয় আলোড়ন এর প্রতিনিধিত্ব করে। বিদ্যুৎ চৌম্বক ক্ষেত্র আর মহাকর্ষ তরঙ্গ ক্ষেত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ক্ষেত্র তত্ত্বেরই প্রকাশ মাত্র। আবার বৈজ্ঞানিকদের এও বিশ্বাস ছিল যে, বস্তু বা গ্রহ নক্ষত্রের গোলাকার আকৃতির জন্য (স্থান কালের বক্রতা) তাদের মাঝে তলটানের (surface tension) সৃষ্টি হয়। তাই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। প্রকৃতিতে চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে আবার গতিশীল তড়িৎআধান তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। তেমনি আমরা যদি মহাশূন্যকে গতিশীল গ্রহ নক্ষত্রের পরিবর্তী মহাকর্ষ তরঙ্গ এক্ষত্র বা গ্যাভিটন ফিল্ড মনে করি আর মহাকর্ষ তরঙ্গ গতি যদি অবিরত ঝাঁকে দুলতে থাকে এবং এ তরঙ্গের যদি মধ্যমের উপর চাপ দেয়ার শক্তি থাকে তবে প্রবাহ অভিমুখী মাধ্যমে এর চাপ থেকে প্রতিক্রিয়া বলের উদ্ভব হবেই। পাশাপাশি প্রতিক্রিয়া বলের জন্য মাধ্যম তলটান (surface tension) অনুভব করবে বিধায় তারা একে অপরকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আকর্ষণ করবে। আমরা জানি পানির গভীরতা যত বেশী হয় তার চাপ তত বাড়ে। এক্ষেত্রে মহাকর্ষ তরঙ্গেক্ষেত্রে বা গ্যাভিটন ফিল্ড এর গভীরতা বা উচ্চতা যত বেশী হবে তার চাপও তত বেশী হবে। এ ধরণা থেকে আমরা বলতে পারি যে, পৃথিবীর কাছের গ্যাভিটন ফিল্ডের উচ্চতা বা গভীরতা পৃথিবীতে ওজন সৃষ্টির মতো বিস্তৃতি নিয়ে দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে বলেই পৃথিবীতে ওজন নেয়া সম্ভব হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হলো গ্যাভিটন বা মহাকর্ষ তরঙ্গ কি? এবং এর উৎপত্তি কিভাবে? আইনস্টাইনের মহাকর্ষ মতবাদ কোয়ান্টাম মতবাদে প্রায় সমসাময়িক এবং মহাকর্ষ ক্ষেত্র তত্ত্ব ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্র তত্ত্বের সদৃশ। একটি চার্জ যেমন বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি করে তেমনি একটি ভরও মহাকর্ষ তরঙ্গ

সৃষ্টি করবে। এ মহাকর্ষ তরঙ্গ পৃথক শক্তির প্যাকেট বা কোয়ান্টাম পর্যায়ের বলে মনে করা হয়। পদার্থের মৌলিক কণা নানা রূপ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় ক্ষেত্রকণা শোষণ ও বর্জন করে। তেমনি মহাকর্ষীয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় প্রতিটি মৌলিক কণার ফোটনের ক্ষেত্রে গ্যাভিটন শোষণ ও নিঃসরণ ঘটে। বর্তমান পর্যন্ত গ্যাভিটনের উৎস হিসেবে এটাই মনে করা হয়। এটা যদি সত্য হয় তবে প্রকৃতিতে গ্যাভিটন থাকলে প্রতি বস্তুর মতো এ্যান্টি গ্যাভিটন থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধারণা খুব দুর্বল প্রকৃতির হওয়ায় এখন পর্যন্ত নভো বল বিদ্যায় স্থান পায়নি। মূলতঃ ফোটন গ্যাভিটন শোষণ ও নিঃসরণ করে না। এ সম্পর্কে আমার অভিমত হলো মহাজাগতিক বিশ্বে সুদূর অতীতে কণা পর্যায় থেকে নিয়ে প্রতিটি জ্যোতিষ্ক যখন তাদের চার পাশের গ্যাসীয় পদার্থের নির্যাসসহ তাপ তরঙ্গ শোষণ করতে থাকে তখন এক পর্যায়ে সকল গ্যাসীয় উপাদান নিঃশেষ হয়ে যায়। তারপর প্রত্যেকেই প্রত্যেককে নিজের দিকে টানতে থাকে এবং শূন্যের শেষ নির্যাস কসমিক ব্যাক গ্রাউন্ড মাইক্রোওয়েভকে তারা হজম করতে চায়। পাশাপাশি শূন্য মন্ডলীর শেষ নির্যাসও তাদেরকে টানতে থাকে। এর ফলে মহাবিশ্ব ব্যাপক আলোড়ন শুরু হয় এবং গ্রহ নক্ষত্র গুলোতে অক্ষগতি ফিরে আসে। এ আলোড়ন শেষ পর্যন্ত একটি লব্ধিমান ফিরে পায়। তখন শূন্য মাধ্যমের শেষ নির্যাসের সাথে গ্রহ নক্ষত্রগুলোর একটা সমতা ফিরে আসে। এতে শূন্য মাধ্যমের শেষ নির্যাসকে তারা হজম করতে পারে না। ফলে কসমিক ব্র্যাগ গ্রাউন্ড মাইক্রোওয়েভ মহাকর্ষ তরঙ্গ গতি লাভ করে। ফলে শূন্য মন্ডলী হয়ে যায় মহাকর্ষ তরঙ্গ ক্ষেত্র। এরপর থেকে মহাকাশের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ গতি সর্বদাই অলীক তরঙ্গ ঝাঁকে দুলছে।

এটা অনেকটাই পরিবর্তনশীল চুম্বক শক্তির চুম্বক ক্ষেত্র তৈরীর মতোই। মূলতঃ তখন থেকেই মহাজগতিক বিশ্বের সকল বস্তুর সাথে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ গতি সংযুক্ত রয়েছে। এ তরঙ্গ গতি প্রবাহ অভিমুখী বস্তুর ভেতর দিয়ে অনায়াসে চলাচল করতে পারে। ফলে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুই মহাকর্ষীয় পোলারায়নে পোলায়িত থাকে। তবে এর প্রবাহ এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করার সময় বস্তুর ঘনত্বের কম/বেশীর জন্য তার কিছু অংশ আলোকের প্রতিফলনের ন্যায় প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। তাই পৃথিবী শুধু আকর্ষণ করে না বরং এর বিকর্ষণ বা দূরে ঠেলার ঝোঁকও রয়েছে। একটি মহাকর্ষ তরঙ্গ ক্ষেত্রের ২টি প্রবাহ ক্ষেত্র রয়েছে। তৎমধ্যে একটি কেন্দ্রমুখী আর অপরটি কেন্দ্র বিমুখী। এ ধরনের প্রবাহ অভিমুখী তরঙ্গ গতি মাধ্যমের উপর চাপ দেয় বলে বস্তুতে ওজন অনুভব হয়।

তাই প্রবাহ অভিমুখী দিকে বৃন্তচ্যুত বস্তু আপাতিত হয়। এক্ষেত্রে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ গতির বেগই বস্তুর বেগ। তাই বড় কিংবা ছোট সকল বস্তুই একই সময়ে মাটিতে পতিত হয়। অপরদিকে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ গতির বেগ ও আহ্নিক গতি একই হয়। পাশাপাশি মহাকর্ষ তরঙ্গ ক্ষেত্রের গভীরতার জন্য প্রবাহ অভিমুখী বস্তুতে চাপ কম বেশী হয়। মূলতঃ মহাকর্ষীয় তরঙ্গ গতির জন্য প্রতিটি বস্তুতে পোলারায়ন ঘটে, এবং বস্তু মহাকর্ষীয় চার্জ অনুভব করে। এর ফলে বস্তুতে ওজন অনুভব হয়। অপর দিকে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ গতির মাধ্যমে বস্তু মহাকর্ষীয় চার্জ লাভ করলে পৃথিবীর উপরের বস্তু মহাকর্ষীয় তরঙ্গ গতির চাপে প্রবাহ অভিমুখী দিকে ধাবিত হয়। এতে বৃন্তচ্যুত আপেল উপরের ফাঁকা শূন্যস্থানের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে পতিত হয়। এখানে পৃথিবীর আকর্ষণের কোন ভূমিকা নেই বরং এক্ষেত্রে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ গতির ভূমিকাই প্রধান। আমাদের চারপাশ বিস্তর এলাকাটা প্রবাহ অভিমুখী গ্যাভিটন ফিল্ড বা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ গতির ক্ষেত্র। এটি পৃথিবীর থেকে ৩২-১০৯ সেঃ মিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। মূলতঃ পৃথিবী যখন ঘুরে তখন ৩২-১০৯ সেঃ মিঃ জায়গা নিয়েই ঘুরে। ফলে কোন বিমান যদি বাংলাদেশের উপরে ৬ ঘন্টা দাঁড়িয়েও থাকে তবু পাকিস্তান খুঁজে পাবে না কারণ পৃথিবীর চার পাশের শূন্য মন্ডলী ও মহাকর্ষীয় তরঙ্গ গতিহার বেগে ঘুরতে থাকে। অর্থাৎ ট্রেনের ভেতরের শূন্য মন্ডল যেমন ট্রেনের সাথে সাথে ঘুরে তেমনি পৃথিবী তার চারপাশের ৩২-১০৯ সেঃ মিঃ দূরত্ব পর্যন্ত নিয়েই ঘুরে। এক্ষেত্রে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ গতির বেগ ও পৃথিবীর আহ্নিক গতি একই। পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র যে একে অপরকে আকর্ষণ করে তা বিজ্ঞানের ছাত্র যারা তারা সবাই আমরা জানি। কিন্তু এদেরও বিকর্ষণ করার ঝোঁক রয়েছে তা হয়ত আমাদের জানা ছিল না। এখন প্রশ্ন হলো আসলেই কি পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র ও বস্তু কণার বিকর্ষণ বল আছে? বিজ্ঞানী নিউটনের মধ্যাকর্ষণ সূত্রটিতে শুধু আকর্ষণের কথাই বলা হয়েছে। অপরদিকে ঐ বিজ্ঞানীর গতির ৩য় সূত্রের ব্যাখ্যা হলো প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। সে হিসেবে আকর্ষণের সাথে বস্তুর কোন প্রকার বিকর্ষণ বল নেই? এ সম্পর্কে বলা যায় নিউটন যখন মধ্যাকর্ষণ সূত্রটি দিয়ে ছিলেন তখন হয়ত কেউ সে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেনি। অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণে আপেল নিচের দিকে পতিত হয়ে থাকে, এটিই বাস্তবে দেখা যায় কিন্ত কোথাও পৃথিবীর বিকর্ষণ বল দিয়ে পোলারায়িত হয়ে কোন আপেল উপরের দিকে চলে যেতে শোনা যায়নি এবং দেখাও যায়নি। ফলে পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র বিকর্ষণ করতে পারে, এমন চিন্তাও কেউ করেনি। স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় সমস্যা না হলে সমাধান পাওয়ার কোন

চেষ্টা থাকে না। তাই হয়ত বিকর্ষণ সম্পর্কে কেউ চিন্তা করেনি। তবে এই তো কিছুদিন আগে গ্রীনল্যান্ডের পদার্থ বিজ্ঞানী মার্ক এন্ডারসন এক পরীক্ষায় দেখেন যে পৃথিবী শুধু কাছেই টানে না, সেটি দূরেও ঠেলে (ইত্তেফাক ৫ আগষ্ট ১৯৮৮)। একে তিনি ৫ম বল হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এই বল প্রকৃতির মৌল চারটি শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াজাত আজানা এক মৃদু বিকর্ষণ বা দূরে ঠেলবার ঝোঁক হিসেবে প্রকাশ পায়।

এর ফলে অনুমান করা হচ্ছে জগৎ-মহাজগতের আকর্ষণ বল অলীক তরঙ্গ ঝাঁকে খেলছে। এ ধারণায় আকর্ষণ বলের সাথে নতুন এক ধরনের সত্তার সম্পর্কের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। এই সত্ত্বা কোয়ান্টাম কণার সাথে সম্পর্কিত বলে কল্পনা করা হয়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে বিকর্ষণ বল মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রায় শতকরা ২ ভাগের মতো। এখন প্রশ্ন হলো ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল যেমন সমান হয়, তেমনি বিকর্ষণ বল আকর্ষণ বলের ন্যায় সমপরিমাণ হয়নি কেন? অপরদিকে আকর্ষণের ক্ষেত্রে যেহেতু আলাদা সত্তা আছে, সে হিসেবে বিকর্ষণের জন্য কি আলাদা সত্তা আছে? এখনো পর্যন্ত যেখানে আকর্ষণের মৌল সত্তার পরিচয় গাণিতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি, সেখানে বিকর্ষণ সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করাই আশা করা যায় না। তবু অনেকেই চিন্তা করেছেন, আকর্ষণ সত্তা যদি গ্যাভিটন হয়, তবে বিপরীত সত্তা হিসেবে এর নাম হবে অ্যান্টি গ্যাভিটন। কিন্তু প্রশ্ন হলো গ্যাভিটন ও অ্যান্টি-গ্যাভিটনের মান ভিন্ন হয় কেন? এই প্রশ্ন রেখেই বলছি, বিষয়টি নিয়ে আমাদের অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে। আমার চিন্তায় জগৎ-মহাজগতের অসীম শূন্য মন্ডল এক ধরনের নতুন সত্তায় পরিপূর্ণ রয়েছে। সেখানে চলছে অলীক তরঙ্গ গতির খেলা। পৃথিবীসহ অন্যান্য জ্যোতিষ্কের দিকে অলীক তরঙ্গ-গতির স্রোত অহরহ বয়ে চলছে। শব্দ, আলোক ও তাপ তরঙ্গের ন্যায় এই তরঙ্গও ঢেউ খেলে চলে। ঢেউ এর ক্ষেত্রে প্রতিফলন, প্রতিসরণ ইত্যাদি থাকে। সেরূপে অলীক তরঙ্গ গতির প্রতিফলন হয়। আমার ধারণা অলীক তরঙ্গ গতির প্রতিফলনের সাথে পৃথিবীর বিকর্ষণ বলের সম্পর্ক রয়েছে। তরঙ্গ যখন কোন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আপাতিত হয়, তখন এক বিশেষ নিয়মের তার কিছু অংশ প্রতিফলিত হয়। মূলতঃ অলীক তরঙ্গ গতি খুব সহজেই সকল মাধ্যমের ভেতর দিয়ে আপাতিত হতে পারে। কদাচিৎ এর খুব কম অংশই প্রতিফলিত হয়। সেজন্য আকর্ষণ বলের তুলনায় বিকর্ষণ বল খুবই নগণ্য থাকে। তার আর একটি কারণ হলো অলীক তরঙ্গ গতি স্থির তরঙ্গের ন্যায় একই স্থানে থেকে সংকোচিত ও প্রসারিত হয় বলে এর কম অংশই প্রতিফলিত হয়।

আলোক বা শুদ্ধ তরঙ্গ যখন কোন সুষম মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অপর কোন সুষম মাধ্যমের উপর আপাতিত হয়, তখন এর কিছু অংশ একটি বিশেষ নিয়মে দুই মাধ্যমের বিভেদ তল হতে প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে, একেই আলোক বা শব্দের প্রতিফলন বলে। আবার একই মাধ্যমের বিভিন্ন অংশের ঘনত্ব ভিন্ন হলেও প্রতিফলন ঘটে। মূলতঃ অলীক তরঙ্গ গতি সকল মাধ্যমের ভেতর দিয়ে অনায়াসে চলতে পারলেও এর কিছু নগণ্য অংশের প্রতিফলন ঘটে। বাস্তবে এর খুব নগণ্য অংশের প্রতিফলন ঘটে বলে আমরা তার আক্রমণ বুঝতে পারি না। অর্থাৎ অল্প পরিমাণ অংশের প্রতিফলন ঘটে বলে আপেলকে উপরের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে না। এর মাধ্যমে বস্তুর মাঝে পুরাপুরি বিপরীতমুখী পোলারায়ন ঘটে না। তবুও এটি পৃথিবীর ৫ম বল বা পৃথিবীর বিকর্ষণ বলের ভূমিকা রাখে। অলীক তরঙ্গ গতি কোয়ান্টাম কণার ন্যায় শক্তি বহন করে। সে কারণে পৃথিবীর প্রতিটি কণা এর মাধ্যমে চাপ অনুভব করে। যখন কোন বস্তুর উপর বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয় তখন বস্তুটি নিজের স্থিতিস্থাপক সীমা বজায় রাখতে বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে। সেই ক্ষেত্রে বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বল তার অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া বলের সমান ও বিপরীত হয়। তাই জড় ভর ও মহাকর্ষ ভর সমানুপাতিক। বাস্তবে বস্তুর অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া বল বিকর্ষণ বল নয়। এই ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিকর্ষণ বল অলীক তরঙ্গ গতির প্রতিফলনের সাথে সম্পর্কিত। এখন প্রশ্ন হলো অলীক তরঙ্গ গতির প্রতিফলন বলকে কি অ্যান্টি গ্যাভিটন কণা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

অনেকেই চিন্তা করেছেন প্রতিকণার সাথে অ্যান্টি গ্যাভিটনের সম্পর্ক থাকতে পারে। সে যাই হউক আমরা একে আলোকের প্রতিফলন রশ্মির ন্যায় অলীক তরঙ্গ গতির প্রতিফলন তরঙ্গ বলতে পারি। আলোক রশ্মি যখন কোন স্বচ্ছ মাধ্যমে ঢুকে তখন এর কিছু অংশের প্রতিফলন ঘটে। অপরদিকে বাকি অংশের প্রতিসরণ হয়। সেভাবে অলীক তরঙ্গ গতি এক ঘনত্বের থেকে অন্য ঘনত্বে পৌছলেই এর খুব কিঞ্চিৎ অংশের প্রতিফলন ঘটে। আপতিত অলীক তরঙ্গ গতির দ্বারা বস্তুতে পীড়ন বা প্রতিক্রিয়া বল তৈরী হয়। কারণ বস্তু তার বিকৃতি বোধ করার জন্য সকল সময় তৎপর থাকে। সে জন্য প্রতিক্রিয়া বল তৈরী হয়। কিন্তু আপাতিত ক্রিয়াশীল বল ও প্রতিক্রিয়া বল সমান বলে কেউ এর আক্রমণ অনুভব করে না। কোন বস্তুর উপর বাইরের থেকে বল প্রয়োগ

করা হলে ঐ বস্তু তার স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে থাকতে চায়। বস্তুর নমনীয় অবস্থার জন্য প্রাথমিকভাবে বিকৃতি ঘটলেও সেটি পুনরায় তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে, যখন বল অপসারণ করা হয়। সকল বস্তুর নমনীয় গুণ এক রকম নয়। যেমন কম ঘনত্বের বস্তু বেশী নমনীয় আর বেশী ঘনত্বের বস্তু কম নমনীয়। ফলে কম ঘনত্বের থেকে যখন মহাকর্ষীয় তরঙ্গ গতি বেশী ঘনত্বের বস্তুতে প্রবেশ করতে চায়, তখন এর কিছু অংশ প্রতিফলিত হয়। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ গতি সর্বদাই বস্তুর ঘনত্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলে। আমরা জানি আপাতিত মহাকর্ষীয় তরঙ্গ গতি সর্বদাই শক্তি বহন করে। অনুরূপভাবে প্রতিফলিত তরঙ্গ গতিও শক্তি বহন করবে। তাই প্রতিফলিত তরঙ্গ গতি, বিপরীতমুখী চাপ দিবে, যা পৃথিবীর মৃদু দূরে ঠেলে দেওয়ার ঝোঁক হিসেবে প্রকাশ পায়। একেই পৃথিবীর বিকর্ষণ বল মনে করা হয়।

অতঃপর বলা যায় আপতিত চাপ=প্রতিসরণ; চাপ+প্রতিফলন=চাপ। সুতরাং প্রতিফলন বল=আপতিত বল-প্রতিসরণ বল। এখানে প্রতিফলন বল খুবই কিঞ্চিৎ। এর কারণ হলো মহাকর্ষীয় তরঙ্গ গতি খুব অনায়াসেই সকল মাধ্যমে চলাচল করতে পারে। এরপরও কিছু অংশের প্রতিফলন ঘটে। যা দূরে ঠেলে দেবার ঝোঁক হিসেবে প্রকাশ পায়। তাই বলা যায় প্রত্যেক বস্তুরই বিকর্ষণ ঝোঁক রয়েছে। কারণ জগৎ মহাজগতের প্রত্যেক বস্তুর সাথে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ গতি একান্তভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং এর প্রতিফলন হয়েই থাকে। সে কারণে পৃথিবীর বিকর্ষণ ঝোঁক রয়েছে।

ডাঃ মোঃ আক্কাস উদ্দীন (মেহেদী)
হাসপাতাল গেট, তারাইল
কিশোরগঞ্জ।

বিদ্যুতের উৎস হিসেবে হৃদস্পন্দন ও দেহের চাপের ভূমিকা

এম এ ওহাব

মানুষ যখন আলো জ্বালতে শেখেনি তখনও পৃথিবীতে আলো ছিল, ছিল আগুনের উৎস। একইভাবে মানুষের বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পূর্বেও এ পৃথিবীতে নানাভাবেই বিদ্যুতের অস্তিত্ব ছিল, পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের উন্নতিতে মানুষ পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে যথাসম্ভব সহজলভ্য প্রক্রিয়ায় সেসব উৎস থেকে উপযুক্ত রূপান্তরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। আর এই বিদ্যুতের আবিষ্কার মানব সভ্যতায় এ বিশাল বিজয় এনে দেয়। এ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে মানুষ যখন নানা সমস্যা পেরিয়ে নিজেকে কিছুটা হলেও সুবিধাজনক অবস্থায় আনতে ব্যস্ত, ঠিক এরই মধ্যে বিজ্ঞানীদের নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির উন্নয়নে মানুষের মাঝে নতুনভাবে আশার সঞ্চার করে, জীবনধারায় সাফল্য এনে দেয়। আর এভাবেই নতুন নতুন গবেষণা মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিয়ে দিনে দিনে এ পৃথিবীটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সভ্যতার ক্রম-বিকাশে আজ আমরা এমন এক অবস্থানে এসে পৌঁছেছি, আমাদের জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে, বলা যায় প্রতি মুহূর্তেই আমরা বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। তাই মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারার সাথে বিদ্যুৎ একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়। শিল্পকারখানা ও বড় যান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য শুধু বড় বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনই নয়, এ আধুনিক যুগে ক্ষুদ্র বা কম মানের বিদ্যুৎ ও বহু কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল রেখে নানা উৎসকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবনে চেষ্টা চলছে। বিজ্ঞানীরা দেহের হৃদস্পন্দন থেকে বিদ্যুৎ তৈরির উৎস খুঁজে পেয়েছেন, যা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। নিম্ন শক্তির বা অল্প মানের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা কৌশল জনপ্রিয় হয়েছে, এর মধ্যে পিজোইলেকট্রিক প্রযুক্তি উলেখযোগ্য যা কোনো প্রকারের চাপ থেকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়। এ কাজের জন্য উপযুক্ত পিজোইলেকট্রিক ক্রিস্টালের প্রয়োজন হয়। সচরাচর ব্যবহৃত পিজোইলেকট্রিক ক্রিস্টালগুলোর মধ্যে টুরমালাইন, রচেল সল্ট এবং কোয়ার্টজ উলেখযোগ্য। এসব পদার্থ বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়। এ ক্রিস্টালগুলো মৃদু চাপ পেলেও তা থেকে সমতুল্য বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে অর্থাৎ ক্ষুদ্র মানের ভোল্টেজ উৎপন্ন করে। আবার এসব ক্রিস্টালের সাপেক্ষে ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে কম্পনের সৃষ্টি হয়। আর পদার্থের এমন গুণ বা বৈশিষ্ট্য পিজোইলেকট্রিক ক্রিয়া হিসেবে পরিচিত।

এজন্য এগুলোকে পিজোইলেকট্রিক ক্রিস্টাল বলা হয়। পৃথিবীর কিছু অঞ্চলে খনিজ উপাদান হিসেবে পিজোইলেকট্রিক পদার্থ পাওয়া যায়, যা প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট টুকরা বা স্পাইস আকারে ব্যবহার করা যায়। সুস্থিত পাল্‌স্ তৈরিতে পেসমেকারে যেমন পিজোইলেকট্রিক ক্রিস্টাল ব্যবহার হয়, তেমনি স্বাভাবিক হার্ট পালসের ক্ষুদ্র চাপ থেকেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। পেসমেকার সচল রাখতে ক্ষুদ্র মানের বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়, যার মান ১ ওয়াটের মিলিয়ন ভাগের ১ ভাগের সমান। ফলে বিশেষ ব্যাটারির সাহায্যে এই ডিভাইস কয়েকবছর সচল থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. আমিন কেরামি বলেছেন, মানুষের স্বাভাবিক হৃদস্পন্দনের চাপ থেকে যে স্বল্প মানের বিদ্যুৎ তৈরি হবে, তা দেহে স্থাপনকৃত কৃত্রিম পেসমেকারের ব্যাটারিকে চার্জ করতে পারবে। এতে নতুনভাবে ব্যাটারি পরিবর্তন ছাড়াই পেসমেকার সারাজীবন সচল থেকে পাল্‌স্ উৎপন্ন করে যাবে। সম্প্রতি লস এঞ্জেলসের হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ১ ইঞ্চির হাজার ভাগের ১ ভাগ পুরুত্ববিশিষ্ট পিজোইলেকট্রিক সিরামিকের একটা টুকরো

বুকের চামড়ার নিচে স্থাপনকৃত অবস্থায় হৃদস্পন্দন থেকে স্বাভাবিক ব্যাটারির চেয়ে ১০ গুণ বেশি বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করতে সক্ষম, যা অন্য কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি ছাড়া পেসমেকারকে দীর্ঘদিন বা সারাজীবনই সচল রাখবে। ইলেকট্রনিক স্টেথোসকোপে দেহের সাথে সংযুক্ত অংশে ক্রিস্টাল মাইক্রোফোন হৃদস্পন্দন থেকে এভাবেই শব্দশক্তিকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তিত করে, পরবর্তীতে কানের সাথে সংযুক্ত লাউডস্পিকার মূল হার্টের শব্দটাই পুনঃউৎপাদন করে। তবে এ ধরনের প্রযুক্তি দেহের বাইরেও ব্যবহার হতে পারে। সম্প্রতি ন্যানোটেকনোলজির সুবাদে টি-শার্টের সাথে জিঙ্ক অক্সাইড ও গোল্ডের প্রলেপযুক্ত অতি পাতলা পাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে, হাঁটা-চলার সময় দেহের ঝাঁকুনি থেকেই এ প্রযুক্তি ক্রিয়াশীল হয়। গবেষকরা বলেছেন, এ বিদ্যুতের সাহায্যে দেহের সাথে সংযুক্ত বা বহনযোগ্য ছোটখাটো যন্ত্র চালানো সম্ভব।

ব্রিটেনের নিউক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মাইকেল পোজি দেহের মৃদু স্পন্দনের চাপে ক্রিয়াশীল হয়, এমন কৌশলে সৃষ্ট বিদ্যুৎশক্তি উদ্ভাবন করেছেন, যাকে বলা হচ্ছে 'পিটসিক্যাটো' শক্তি। মানুষের ঘাড়ের পেশী খুবিই সংবেদনশীল। স্থিরভাবে বসে থাকলে বা কাজ করলে এ পেশীর নড়াচড়া হয়। তাই ঘাড়ের ওপর স্থিরভাবে বিশেষ ডিভাইস স্থাপন করে পেশীর নড়াচড়াজনিত চাপ থেকে তিনি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেছেন। তাছাড়া এই ডিভাইসে সংযুক্ত একটা রিং থাকে যা হাঁটার সাথে ঘুরতে ঘুরতে চাপ সৃষ্টি করে। এই বিজ্ঞানী মনে করেন, এভাবে তৈরি বিদ্যুৎ দিয়ে নৌ-স্যাটেলাইটও চালানো সম্ভব।

ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা এবং দ্রুত পথচলা থেকেও উপযুক্ত ডিভাইস ব্যবহার করে বিদ্যুতে রূপান্তর করেছেন। এ ছাড়াও লন্ডনের টেডিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা পায়ের গোড়ালির চাপকে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ জুতার সাথে পিজোইলেকট্রিক ডিভাইস স্থাপন করে উৎপন্ন বিদ্যুতের সাহায্যে ব্যাটারিকে চার্জ করে সে শক্তিকে ব্যবহার করার কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, গৃহে মানুষ যেসব কাজ করে সেগুলো থেকেও দেহে স্পন্দন সৃষ্টি হতে পারে, যা উপযুক্ত ব্যবস্থায়

কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এ ছাড়াও গৃহে ব্যবহৃত কিছু যন্ত্র যেমন- ওয়াশিং মেশিন বা এ জাতীয় অন্যান্য ডিভাইস থেকেও উৎপন্ন কম্পনকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুতে রূপান্তর করা যায়, যা দিয়ে মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য ছোট যন্ত্র চালানো সম্ভব। এভাবে হৃদস্পন্দন ও দেহের অন্যান্য অঙ্গের কম্পনজনিত সৃষ্ট চাপকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে বিভিন্ন দেশের গবেষকরা কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে এ গবেষণায় অনেক অগ্রগতিও ঘটেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন স্বল্প মানের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ ধরনের কৌশল আগামী দিনে সুফল বয়ে আনবে এবং এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যাপক জনপ্রিয়ও হবে।

এম এ ওহাব
উপপরিচালক (ট্রেনিং), ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট
কমিউনিকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং ডিভিশন
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

তরুণ প্রজন্ম : আত্মনির্ভরশীলতার নতুন সম্ভাবনা

মোঃ নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনবহুল উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশই হলো তরুণ সমাজ। তাদেরকে ব্যতিরেকে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রশিক্ষিত তরুণ সমাজের কোন বিকল্প নেই। বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তিনটি ধাপে। প্রথমে কৃষিনিভর অর্থনৈতিক উন্নয়ন। যা ছিল মানুষের কায়িক পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল। এরপর শিল্পবিপ্লব নাম দিয়ে শুরু হয় শিল্পনির্ভর অর্থনীতির যাত্রা। এখানেও রয়েছে কায়িক শ্রম ও যান্ত্রিকতার মিশেল। যা আজও চলছে। তবে উন্নত দেশগুলো এ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উন্নত দেশগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব নাম দিয়ে শুরু হয় জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির যাত্রা। আজকের পৃথিবীতে যা ওয়েব বা ইন্টারনেটভিত্তিক অর্থনীতি হিসেবে সুপরিচিত। উন্নত দেশগুলো ওয়েবভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলায় প্রথমে গুরুত্ব দেয় প্রশিক্ষণের। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে উন্নত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ইন্টারনেটভিত্তিক অর্থনীতির প্রসার ঘটছে অত্যন্ত দ্রুত।

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে বলা হচ্ছে, যেসব দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত বিকশিত সেসব দেশের অর্থনীতিও ততো উন্নত। কাজের সুযোগও সেসব দেশে বেশি। বিশ্বায়নের এই সময়ে তথ্যপ্রযুক্তিতে যারাই বেশি অগ্রগামী তারাই উন্নয়নের ঝড় তুলছে। বর্তমান বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়া কোনো

দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমরা যদি তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রসরমান দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই ওইসব দেশ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তির প্রয়োগ করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ (বিসিজি) এক গবেষণায় বলেছে ২০১৬ সালের মধ্যে জি-২০ ভুক্ত দেশগুলোতে ওয়েবভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠবে। ২০১১ সালে জি-২০ ভুক্ত দেশে ওয়েবভিত্তিক অর্থনীতির পরিমান ছিল ২.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা ২০১৬ তে গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় দ্বিগুন অর্থাৎ ৪.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের অর্থনীতির দিকে তাকালে দেখতে পাই, তথ্যপ্রযুক্তির অবদান দেশটির অর্থনৈতিক ভিতকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেছে। বিসিজি'র গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের ইন্টারনেট অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে অত্যন্ত দ্রুত। ২০১৬ সালের মধ্যে ভারতে ইন্টারনেট অর্থনীতির আকার হবে ১০.৮ ট্রিলিয়ন রুপি বা ২১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিশ্বের প্রধান জি-২০ ভুক্ত দেশগুলোর ইন্টারনেট অর্থনীতির ক্রমোন্নতির তুলনায় অনেক দ্রুতগতির। ভারতের ইন্টারনেট অর্থনীতি বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং এ খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে ২০ লক্ষ মানুষের। তথ্য প্রযুক্তিতে বিশ্ব যখন এগিয়ে চলছে তখন বাংলাদেশের অবস্থা কী সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

আইসিটিভিত্তিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের বাস্তবতাঃ

এ বছরের ২১ জানুয়ারি তথ্যপ্রযুক্তির অন্যতম দিকপাল বিল গেটসের একটি বক্তব্য ছাপা হয় বিল অ্যান্ড মিলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা সিএনবিসিতে। এতে তিনি বলেন, B-2035, There will be almost no poor countries left in the world."এ প্রসঙ্গে তিনি তিনটি বিষয়ের উলেখ করেন।

এক. ডিজিটাল বিপ্লব;
দুই. ভেকসিন উদ্ভাবন এবং
তিন. উন্নত বীজ উদ্ভাবন।
এ তিনটি কারণে ২০৩৫ সালের মধ্যে দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী গড়ে উঠবে। এতে

প্রধান ভূমিকা পালন করবে ডিজিটাল বিপ্লব। বাংলাদেশ এই ডিজিটাল বিপবে শামিল হয় ২০০৯ সালে। বর্তমান সরকার ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে রুপকল্প ২০২১ ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষকে স্বপ্ন দেখায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকারটি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের পর বর্তমান সরকারের প্রাধিকার কর্মসূচিতে স্থান পায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ। শুরু হয় তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভব অর্থনীতি গড়ে তোলার নবতর যাত্রা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের স্তর হলো চারটি। যেমনঃ-

১. মানবসম্পদকে একুশ শতকের উপযোগী করে গড়ে তোলা;
২. সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং অর্থপূর্ণভাবে নাগরিকদের সংযুক্ত করা;
৩. সকল নাগরিকের দ্বারপ্রান্তে সেবা পৌঁছে দেয়া এবং
৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতসমূহ ও বাজার ব্যবস্থাকে আরো উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক করে গড়ে তোলা।

বিগত পাঁচ বছর ১০ মাসে সরকার এ চারটি স্তম্ভের লক্ষ্য পূরণে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, অর্থ ব্যবস্থার ডিজিটালইজেশন, চার হাজার ৫৪৭টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, পৌরসভা ডিজিটাল সেন্টার ও সিটি কর্পোরেশনের অধীন ওয়ার্ড ডিজিটাল সেন্টার, মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ, স্বাস্থ্য সেবার জন্য টেলিমেডিসিন সেন্টার, ২৫ হাজার ওয়েব পোর্টালের জাতীয় তথ্য বাতায়ন, জাতীয় ই- তথ্য কোষ, আখ চাষীদের জন্য ই- পুঁজি চালুসহ বিভিন্ন সেবার ডিজিটালইজেশন করায় দেশের অধিকাংশ মানুষ এর সুফলভোগী । শুধমাত্র ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকেই প্রতিমাসে ৪৫ লক্ষ মানুষ ৬০ ধরণের সেবা গ্রহণ করছে। এ সরকার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি বান্ধব পরিবেশ তৈরি করায় আইসিটি শিল্পে এর ইতিবাচক প্রভাব লক্ষণীয় । বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফ্টওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এর তথ্য মতে, ২০১২-১৩

অর্থবছরে শুধুমাত্র সফ্টওয়্যার রপ্তানি থেকে আয় হয় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানি আয় থেকে প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি। এ থেকে ধারণা করা যায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সফ্টওয়্যার রপ্তানি আয় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে । হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার খাত প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। ইতোমধ্যে আইটি সেবার মাধ্যমে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার সৃষ্টি হয়েছে এবং ৫০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে । ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের নানা উদ্যোগ বহির্বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আমাদের ইতিবাচক ভাবমূর্তিকে তুলে ধরেছে । ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার আমাদের জন্য অনন্য সম্মান বয়ে এনেছে। জাতিসংঘ সাউথ- সাউথ অ্যাওয়ার্ড, ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড, ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স অ্যাওয়ার্ড ও জাতিসংঘ সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড বাংলাদেশের ঘরে এসেছে। বাংলাদেশ সরকারের নিরলস পরিশ্রম ও কূটনৈতিক দক্ষতায় দ্বিতীয় বারের মতো আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের কাউন্সিল সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ। এরপরও আমাদের আইসিটিভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। গড়ে তুলতে হবে দক্ষ মানব সম্পদ।

আইসিটিভিত্তিক উন্নয়নের ধাপ হলো চারটিঃ

আইসিটিভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের বিচেনায় রয়েছে চারটি ধাপ। সে বিবেচনা থেকেই বিভিন্ন উদ্যোগ, প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে বিকশিত করার জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলছে । কারণ দক্ষ মানব সম্পদ ছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশ সম্ভব নয়। সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়ণ, প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তাই দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

চার ধাপে যেভাবে কাজ হচ্ছেঃ

প্রথম ধাপেঃ তৃণমূলে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার , বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ,

পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে কম্পিউটার ও আইটি প্রশিক্ষিত মানুষ তৈরি করা হচ্ছে। আমরা যদি শুধু ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কথা ধরি তবে দেখতে পাই ৪৫৪৭ টি ইউডিসি বিগত চার বছরে গ্রামে এক লক্ষেরও বেশি তরুণ- তরুণীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিবছর আরও বেশ কয়েক হাজার কম্পিউটার ও আইটি প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এসব কম্পিউটার ও আইটি প্রশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের টার্গেট করেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপঃ প্রথম ধাপের এই সব কম্পিউটার ও আইটি প্রশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের টার্গেট করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলায় বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন করছে। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্প এবং মোবাইল অ্যাপ তৈরিতে দক্ষ করে তোলার জন্য জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে।

তৃতীয় ধাপঃ ফ্রিল্যান্সার টু এন্টারপেনর (উদ্যোক্তা) তৈরি। বর্তমানে যেসব ফ্রিল্যান্সার তৈরি হচ্ছে তাদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। যাতে একজন উদ্যোক্তা বিশ জনেরও অধিক ফ্রিল্যান্সারকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে পারেন।

চতুর্থ ধাপঃ এন্টারপ্রেনর টু বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও)। দেশের সাত বিভাগ ও বেশ কয়েকটি জেলা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হাই-টেক পার্ক নির্মাণ করেছে। ভবিষ্যতে সেখানে এসব উদ্যোক্তাদের বিপিও পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ করে দেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

এই চার ধাপের বিশ্লেষণ করলে আমার দেখতে পাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দ্বিতীয় ধাপে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্পের আওতায় ফ্রিল্যান্সার তৈরি করছে। যা দেশের তরুণ-তরুণীদের ঘরে বসে আউটসোর্সিংয়ের কাজ

করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এ নিবন্ধে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হচ্ছে।

আত্মনির্ভরশীলতায় আউটসোর্সিং খাতঃ

বর্তমানে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার গতি অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় বেশি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, আগামী এক দশকের মধ্যে বিশ্বে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যা হবে বর্তমান জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। ঘরে বসে আয়ের পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল ও আপন পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শনের সাহায্যে টাকা আয়ের মাধ্যমে নিজের ক্যরিয়ারকে বিকশিত করা যায় আউটসোর্সিংয়ের সাহায্যে। পরিবারের সবার কাছাকাছি থাকার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন আরও অটুট হয়। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মাধ্যম হচ্ছে আউটসোর্সিং। সহজ আয়ের সেরা মাধ্যম হিসেবে এরই মধ্যে সমাদৃত হয়ে উঠেছে এটি। বহির্বিশ্বের কাজ কম্পিউটারের মনিটরে সাজিয়ে দিচ্ছে কয়েকটি মধ্যস্থতাকারী ওয়েবসাইট, যাদের বলা হচ্ছে মার্কেটপেস। এ মার্কেটপেসই হতে পারে আয়ের নতুন ঠিকানা। বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় এসব মার্কেটপেসের মধ্যে রয়েছে মুক্ত পেশাজীবীদের কাজের সুযোগ। এখানে কাজ করে যে কেউ সফল হতে পারে। বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অনেক কাজই এখন বাইরের প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি দিয়ে করিয়ে নেয়। যুক্তরাষ্ট্র একাই বছরে প্রায় ৫০ হাজার কোটি ডলারের আউটসোর্সিং করছে। শুধুমাত্র ইল্যান্স-ওডেস্ক মার্কেট পেসে ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাজ রয়েছে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকলে যে কেউ কাজগুলো পেতে অংশ নিতে পারে। তথ্য প্রযুক্তির বহুবিধ ব্যবহার থেকে আয় বিশ্বের অনেক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখছে। সারাবিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে প্রতিবছর আয় প্রায় এক হাজার বিলিয়ন ডলার। সফ্টওয়্যার রফতানি, প্রোগ্রামিং, আউটসোর্সিংসহ অনেক উৎস থেকে এ আয় হচ্ছে। এর মধ্যে উলেখযোগ্য একটি উৎস আউটসোর্সিং। আত্মনির্ভরশীল মানুষ গড়ে তোলায় আউটসোর্সিং খাত অপার সম্ভাবনা তৈরি করছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। বর্তমানে বিশ্বে ৪২২

বিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্টাফিং মার্কেট রয়েছে যার মাত্র ১০ শতাংশেরও কম অনলাইন মার্কেটে এসেছে। সময় এসেছে আউটসোর্সিংসহ অনলাইনভিত্তিক কাজের দ্রুত প্রসার ঘটানো এবং বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের স্টাফিং এর বাজারকে অনলাইন বাজারে নিয়ে আসার। বাংলাদেশ এ বাজার ধরতে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

তরুণদের সামনে অপার সম্ভাবনাঃ

বাংলাদেশ আউটসোর্সিংয়ের এ উৎসকে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জনকে উৎসাহিত করছে। ২০১২ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দেশের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য লার্নিং এন্ড আর্নিং কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং প্রথম পর্যায়ে প্রায় ১৫ হাজার ফ্রিল্যান্সার তৈরি করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্পের অধীনে ৫৫ হাজার শিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। বাংলাদেশের জন্য আউটসোর্সিংই হচ্ছে এ সময়ের সবচেয়ে টেকসই কর্মক্ষেত্র। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের ওয়েবে, গ্রাফিক্স ডিজাইন, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, সোসাল মার্কেটিং, থিম ডিজাইন, প্রোগ্রামিং, ওয়েবসাইট ম্যানেজমেন্ট, লিংক বিল্ডিং, ডাটা এন্ট্রি টাইপিং, আর্টিকেল বা বগ রাইটিং বিষয়ে প্রশিক্ষিত করবে লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্প।

বর্তমানে সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তি উদ্যোগে দেশে এখন প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক তরুণ-তরুণী আউটসোর্সিংয়ের উৎস থেকে আয় করার জন্য বিভিন্ন মার্কেট পেসে নিবন্ধন করেছে। এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি সক্রিয় ফ্রিল্যান্সার। যারা বছরে ৫০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় করেছে। বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা যে মার্কেট পেসটিতে সবচেয়ে বেশি নিবন্ধন করেছে সেটি হচ্ছে ইল্যান্স-ওডেস্ক। এ মার্কেট পেসটিতে নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা সাড়ে চার লাখ। ২০১৩ সালে ইল্যান্স-ওডেস্ক থেকে আয় ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের আয় থেকে ৩৫ শতাংশ বেশি। ২০১৪ সালে আয় ২০১৩ সালের ৩৫ শতাংশের প্রবৃদ্ধির চেয়েও বেশি হবে বলে আশা করছে ইল্যান্স-ওডেস্ক। বাংলাদেশের ফিল্যান্সাররা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মার্কেট পেসে আউটসোর্সিং কাজে শক্ত অবস্থান করে

নেয়। ইল্যান্স-ওডেস্ক একীভূত হওয়ায় পর বিশ্বের ১৮৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ৭ম। আউটসোর্সিংয়ে আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমশই সংহত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক শীর্ষ ব্যবস্থাপনা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এটি কারনির গ্লোবাল সার্ভিস লোকেশন (জিএসএল) সূচকে বিশ্বের ৫১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ২৬তম অবস্থানে উঠে এসেছে। ২০১৪ সালে ১৯ সেপ্টেম্বর এটি কারনির প্রতিবেদনে বলা হয় আউটসোর্সিংয়ে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এর ফলে বিশ্বস্ততা এবং নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আউটসোর্সিং স্ট্যাটাসে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। আউটসোর্সিংয়ে এই অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্প আত্মনির্ভরশীল মানুষ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তরুণেরাই গড়বে দেশঃ

ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায়, আমাদের সব অর্জন অদম্য তারুণ্যেরই জয়গাঁথা। তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে তারাই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নানা সৃষ্টিশীল উদ্যোগ অর্জনে, কৃতিত্বে তারাই আমাদের জন্য নতুন আশার সঞ্চারক। ১১ নভেম্বর ২০১৪ জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এখন ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণের সংখ্যা পৌনে পাঁচ কোটি। এর সঙ্গে ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী যুব জনসংখ্যাকে ধরলে বলা যায় মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগই টগবগে তরুণ। আর সিআইএ-দ্যা ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক' এর মতে যখন কোন দেশের কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা আনুপাতিক হারে সবচেয়ে বেশি থাকে তখন একটি দেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টে বা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসে প্রবেশ করে। ২০১২ সালে বাংলাদেশ এ ডেমোগ্রাফিক বোনাস এ প্রবেশ করেছে। কর্মক্ষম মানুষের এই প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে আগামী আরও দুদশক। ঠিক এরকম জনসংখ্যা-সুবিধা নিয়েই ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে পূর্ব এশীয় টাইগার অর্থনীতির দেশগুলো উন্নতি করেছিল। চীন বিপ্লবের পরের উত্থানও ছিল অনেকটা তরুণদের রক্ত ও ঘামের ফসল। ষাটের দশকে দক্ষিণ

কোরিয়াও একই রকম জনসংখ্যা সুবিধা অর্জন করেছিল। তারা একে কাজে লাগিয়ে আজ শিল্প সমৃদ্ধ দেশ। বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগামী দেশের শীর্ষ তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। আশার কথা হচ্ছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশের রুপকার। তার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা খ্যাতিমান কম্পিউটার বিজ্ঞানী, বয়সে তরুণ, আধুনিক ও বিজ্ঞান-মনস্ক। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী সাংসদ, তারুণ্যের চিন্তা চেতনার ধারক ও বুদ্ধিদীপ্ত। তাদের ভাবনায় রয়েছে আমাদের যুবশক্তিকে তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। বিশেষ করে যারা মোটামোটি শিক্ষিত এবং প্রতিবছর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে।

আমাদের প্রত্যাশা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ লার্নিং এন্ড আর্নিং, ফ্রিল্যান্সার টু ইন্টারপ্রেনর মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, লিভারেজিং আই-সিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স প্রকল্পের মতো দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির আরও অনেক কর্মসূচি চালু করে ওইসব তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসবেন। এটা সম্ভব হলে ২০১৭ সালের মধ্যেই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান অন্তত ২০ শতাংশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তখন শুধু আত্মনির্ভরশীল মানুষ নয়, বিশ্বে বাঙালিরা একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে।

মোঃ নজরুল ইসলাম
প্রকল্প কর্মকর্তা
(সেকায়েপ)
শিক্ষা ভবন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
১৬, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

এইচআইভি প্রতিরোধক বড়ি

অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একদল স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ঘাতক ব্যাধি এইডসের জন্য দায়ি এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধী হিসেবে একটি বড়ি সেবনে সমর্থন দিয়েছেন। এইচআইভি প্রতিরোধী হিসেবে এই প্রথম কোনো ওষুধ মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সমর্থন পেল। ট্রুভাডা নামের বড়িটি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফডিএ) অনুমোদনের অপেক্ষায়। এফডিএ এটি দ্রুত অনুমোদন করতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। এফডিএর উপদেষ্টা প্যানেল দ্য এন্টিভাইরাল ড্রাগ অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্যরা দীর্ঘসময় ধরে বৈঠক করেন। এতে এইচআইভি প্রতিরোধী হিসেবে ট্রুভাডা ব্যবহারের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হয়। এটি ব্যবহারের পক্ষে ১৯ জন এবং বিপক্ষে তিনজন যুক্তি উপস্থাপন করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেয়ে কমিটি এফডিএকে ট্রুভাডা অনুমোদনের আহ্বান জানিয়েছে। কমিটির সুপারিশে বলা হয়, সমকামী ও বাইসেক্সুয়াল (নারী ও পুরুষ উভয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী) পুরুষদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে ট্রুভাডা। একাধিক পুরুষের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে এইচআইভি সংক্রমণের সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন- এমন সমকামী পুরুষদের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিদিন ট্রুভাডা সেবনের অনুমোদন চেয়েছে তারা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক ওষুধ কোম্পানি জিলিড সায়েন্সেস ২০০৪ সালে ট্রুভাডা বাজারে ছাড়ে। এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তিদের

চিকিৎসায় এমট্রিভা ও ভাইরেড নামের দুটি ওষুধের সাথে ট্রুভাডা ব্যবহৃত হচ্ছে। এইচআইভি ভাইরাস ধ্বংসের জন্য চিকিৎসকরা তিনটি ওষুধ একসাথে ব্যবহারের পরামর্শ দেন। উপদেষ্টা কমিটি এবার এইচআইভি প্রতিরোধের জন্য শুধু ট্রুভাডা ব্যবহারের পরামর্শ দিলো।

তবে গবেষণায় দেখা গেছে, নারীদের মধ্যে এই ওষুধ খুব একটা কার্যকর নয়। উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১২ লাখ এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তির দুই-তৃতীয়াংশই সমকামী ও বাইসেক্সুয়াল পুরুষ। ২০১০ সালে ট্রুভাডা প্রথমবারের মতো খবরে পরিণত হয়। সরকারি গবেষকরা ওষুধটির এইচআইভি প্রতিরোধী ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারেন। তিন বছরের গবেষণায় তাঁরা দেখতে পান, প্রতিদিন ট্রুভাডা সেবনের ফলে সমকামী ও বাইসেক্সুয়াল পুরুষদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি ৪২ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। তবে ট্রুভাডার পাশাপাশি কনডম ব্যবহার এবং চিকিৎসকদের পরামর্শও নিয়েছেন তাঁরা। সাম্প্রতিককালের অন্য এক গবেষণায় দেখা যায়, বিপরীত লিঙ্গের সাথে যৌন সম্পর্ক থাকা ব্যক্তিদের মধ্যেও ট্রুভাডা এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়েছে। এসব ব্যক্তির নারী বা পুরুষ সঙ্গী এইচআইভি সংক্রমিত ছিলেন। এ কারণে অনেক চিকিৎসকই এখন এইচআইভি প্রতিরোধের জন্য এ বড়ি সেবনের পরামর্শ দিতে শুরু করেছেন। তবে এই ওষুধ ব্যবহারের জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই এইচআইভি নেগেটিভ হতে হবে। এইচআইভি প্রতিরোধী ওষুধ হিসেবে ট্রুভাডার ব্যবহার নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, বহুদিন ধরে ট্রুভাডা সেবনের ফলে একসময় দেহে এমন অবস্থা তৈরি হতে পারে যে ওষুধটি আর এইচআইভির বিরুদ্ধে আর কোনো কাজ করবে না। কেবল তাই নয়, এই ওষুধ সেবনকারীদের মধ্যেও এইচআইভি থেকে নিরাপদ থাকার ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হবে। ট্রুভাডার মতো দামি ওষুধের প্রতি মনোযোগ বাড়াতে গিয়ে এইচআইভি প্রতিরোধের সুলভ উপায়গুলোর তহবিল কমে আসবে বলেও অনেকে আশঙ্কা করছেন। অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ অ্যাডভাইজরি কমিটির বৈঠকে কারেন হফি নামের একজন সেবিকা বলেন, 'ট্রুভাডা অবশ্যই প্রতিদিন এবং নির্দিষ্ট সময়েই সেবন করতে হবে। কিন্তু বহু বছরের

অভিজ্ঞতায় আমি বলতে পারি, এটা সব সময় সম্ভব হয় না।' বিশ্ব জুড়ে এইচআইভি বা এইডসের ভয়াবহতা নিয়ে সবাই যখন চিন্তিত, ঠিক তখনই অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ভয়াবহ এই রোগ প্রতিরোধে চমকপ্রদ এক ব্যবস্থার কথা জানিয়েছেন। এ ব্যবস্থা কমবেশি সবারই হাতের নাগালে। আর তা হলো অতি পরিচিত গরুর দুধ।মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ম্যারিট ক্রামস্কি সাম্প্রতিককালে তাঁর ব্যবসায়িক অংশীদারি প্রতিষ্ঠান অস্ট্রেলিয়ান বায়োটেকনোলজি কোম্পানি ইমুরন লিমিটেডে গরুর দুধের সরের (ক্রিম) পুষ্টিগুণের ওপর গবেষণা চালাতে গিয়ে এই তথ্য উদ্ঘাটন করেন। 'দ্য হেরাল্ড সান' পত্রিকায় এ নিয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষক ম্যারিট ক্রামস্কি জানান, একটি গর্ভবতী গাভীর শরীরে এইচআইভি প্রোটিনযুক্ত টিকা দেওয়ার পর দেখা যায়, বাছুর জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে তার (গাভী) দেহে যে শালদুধ আসে তাতেই থাকে তার সন্তানকে রক্ষাকারী কার্যকরী উপাদান। এই শালদুধ বাছুরের রোগ প্রতিরোধে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। রক্ষা করে এইচআইভির জীবাণু থেকেও। গবেষকরা এই তথ্যের ভিত্তিতে এইডস প্রতিরোধে কাঁচা দুধের কার্যকারিতা ও গুণাগুণ পরীক্ষা করার পরিকল্পনা করছেন। তাঁদের ধারণা, সর জমাট হওয়ার আগের অবস্থায় এই কাঁচা দুধ খেলে নারীরাও উপকৃত হবে। বিশেষত যৌন সংসর্গের মাধ্যমে সঙ্গী থেকে এইচআইভি জীবাণুর সংক্রমণ ঠেকাতে পারে গরুর এই অতি গুণসংবলিত কাঁচা দুধ। তবে বিষয়টি এখনও ধারণাগত পর্যায়েই রয়ে গেছে। গবেষকরা বলেছেন, এ বিষয়ে পরিপূর্ণ ফল পেতে হয়তো অপেক্ষা করতে হতে পারে আরো এক দশক।

অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালক, বাংলা একাডেমি,
ঢাকা।

টেস্টটিউব মাংস

শাহনাজ বেগম

মাংস তো আমরা সবাই খাই। কেউ মুরগির মাংস, কেউ বা খাসির মাংস। আবার অনেকেই গরুর মাংস বেশ পছন্দ করেই খেয়ে থাকে। বিদেশীরা শূকর, ঘোড়া, সাপ, তিমি, সীল ইত্যাদি অনেক প্রাণীর মাংস খেয়ে থাকেন। এই মাংস আমিষজাতীয় খাদ্যের একটি অন্যতম প্রধান উপকরণ। কিন্তু প্রতিদিন যে পরিমাণে মাংস সারা বিশ্বে খাওয়া হয়, বর্তমানে সেই পরিমাণ মাংস উৎপাদিত হলেও ধীরে ধীরে এই উৎপাদন কমে আসছে। তাই ক্রমবর্ধমান মানুষের মুখে পরিমিত পরিমাণ মাংস তুলে দেওয়ার জন্য কৃত্রিম পদ্ধতিতে মাংস তৈরির প্রচেষ্টাও চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। এক্ষেত্রে টেস্টটিউব পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

'টেস্টটিউব বেবি' বিষয়ে এতো দিনে কম-বেশি সবাই অবগত আছেন। কিন্তু যদি শোনা যায় যে, টেস্টটিউবের মাধ্যমে 'পশুমাংস' উৎপাদনের চিন্তা করছেন বিজ্ঞানীরা, তাহলে আশ্চর্য হওয়ারই তো কথা? আশ্চর্য হলেও বিজ্ঞানীদের এ চিন্তাটি সম্ভবত সত্য হতে চলেছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, টেস্টটিউবের মাধ্যমে গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে পশুমাংস উৎপাদনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। চলতি বছরের মধ্যেই এ ধরনের পশুমাংস বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে তাঁরা দাবি করছেন। খাদ্যে মাংসভোজী মানুষের চাহিদা মেটাতে বিশ্বের অন্তত ৩০টি গবেষক দল 'টেস্টটিউব মিট' (Testtube Meat) বা 'টেস্টটিউবে মাংস' উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ পদ্ধতি সফল হলে আর কোনো পশু জবাই বা হত্যা করে মানুষকে মাংস খেতে হবে না। এতে বিশ্বে পশু হত্যা কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন,

জীবিত পশুর দেহ থেকে কোষ সংগ্রহ করে গবেষণাগারে নিয়ে বিশেষ উপায়ে এ মাংস উৎপাদন করা হবে। বিজ্ঞানীদের এ কাজে উৎসাহ দিতে আন্তর্জাতিক প্রাণী কল্যাণ সংস্থা 'পিপল ফর দ্য এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট অব অ্যানিমেল' (People for the Ethical Treatment of Animal, PETA)-এর পক্ষ থেকে ১ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। পেটার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ২০১৬ সালের মধ্যে ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে 'মুরগি'র মাংস উৎপাদন করতে পারলেই এ পুরস্কার দেয়া হবে।' বিজ্ঞানীদের উদ্ধৃতি দিয়ে ফুড সেফটি নিউজের সাম্প্রতিককালের এক সংবাদে জানানো হয়েছে যে, ২০১২ সাল হতে সেই টেস্টটিউবের মাধ্যমে গবেষণাগারে মাংস উৎপাদন চূড়ান্ত হবে। নেদারল্যান্ডসের 'ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসট্রিস্ট'-এর বিজ্ঞানী ড. মার্ক পোস্ট জানিয়েছেন, 'সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ, শিগগিরই ল্যাবে মাংস উৎপাদন শুরু হবে। এ কাজের জন্য ডাচ সরকার ইতোমধ্যে তিন লাখ ইউরো সহায়তা দিয়েছে। তবে তাঁরা মুরগি নয়, উৎপাদন করছেন গরুর মাংস।

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মিসৌরির বিজ্ঞানীরাও এ বিষয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানকার বিজ্ঞানী নিকোলাস জেনেভিস ও রিচার্ড মাইকেল রবার্টস তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে কাজ করছেন। জেনেভিস ইতোমধ্যে ভ্লাদিমির মিরোনোভের সাথে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে কাজ সেরেছেন। মিরোনোভ ব্রাজিল থেকে এ বিষয়ে গবেষণা করে এসেছেন। ব্রাজিলের সরকারও কৃত্রিম উপায়ে মাংস উৎপাদনে সহায়তা করছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, টেস্টটিউব পদ্ধতিতে ১০টি শূকরের পেশির কোষ সংগ্রহ করে দুই মাসের ব্যবধানে তা থেকে ৫০ হাজার টন মাংস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এই পদ্ধতি সফল হলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী পশুর মাংস তৈরি করে নিতে পারবে এবং আমিষজাতীয় খাদ্যের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

শাহনাজ বেগম
বাংলা একাডেমি
ঢাকা।

ছোটদের স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু

লিটন চন্দ্র মহন্ত

যে ক'য়েক জন বাঙালি কে প্রায় পৃথিবীর সব দেশে চেনে এবং জানে তাদের মধ্যে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু অন্যতম। তিনি ছিলেন আমাদের বাঙালির অহংকার এবং জগৎ বিখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী । স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু ছিলেন ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের জনক, তিনি এই উপমহাদেশে বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছেন। বাঙালির বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা কে সুগম করার জন্য নিজের সমস্ত জীবনের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে নির্মাণ করেন নিজ হাতে বসু বিজ্ঞান মন্দির (Bose Institute)। নিজ হাতে গড়ে তুলেছেন সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞান মুখোপাখ্যায়, দেবেন্দ্র মোহন বসু প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানীদের। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু শুধু আধুনিক বিজ্ঞানের জনক নন, সমগ্র বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের একজন। ১৯৭২ সালে লন্ডনের " ডেইলী এক্সপ্রেস " পত্রিকা লিখেছিলেন ; জগদীশ চন্দ্র বসু গ্যালিলিও এবং নিউটনের সমকক্ষ বিজ্ঞানী । বিশ্ব বিজ্ঞানের কিংবদন্তী আইনস্টাইন জগদীশ কে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে- " জগদীশ পৃথিবীকে যে সকল অমূল্য তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন, তার একটির জন্য বিজয় স্তম্ভ স্থাপিত হওয়া উচিৎ।"

ইউরোপের মানুষ যখন গুহায় বসবাস করতো তখন এই আমাদের দেশে প্রায় দুই ডজন ছোট-বড় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, যেমন- পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, শালবন বিহার, আনন্দবিহার ইত্যাদি। ইউরোপের লোকেরা বিজ্ঞান কে কাজে লাগিয়ে এবং গবেষণা কে অব্যাহত রেখে আজ তারা উন্নতির চরম শিখরে পৌচ্ছে গেছে কিন্তু আমরা বিজ্ঞান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আজও উন্নতি তে তাদের সমকক্ষ হতে পারি নাই। ভারতবর্ষের এই ক্লান্তি কালে বিজ্ঞানের পতাকা হাতে নেন স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু। তিনিই প্রথম বিশ্ববাসীকে বোঝাতে সক্ষম হন বাঙালিরাও বিজ্ঞান গবেষণা করে বিশ্ব কে

দেখিয়ে দিতে পারে। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর ময়মনসিংহ শহরে জন্ম গ্রহণ করে, সেই সময় তার পিতা ভগবান বসু ময়মনসিংহের একটি ইংরেজি স্কুলে শিক্ষকতা করতো। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু পৈতৃক বাড়ি বিক্রমপুরের রাড়িখাল গ্রামে। তার মা বামাসুন্দরী বসুও রাড়িখালের পাশ্ববর্তী গ্রামের এক অভিজাত হিন্দু পরিবারের সন্তান। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু কে ১৮৬৯ সালে কোলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। এই স্কুল থেকে ১৮৭৫ সালে স্কলারশীপসহ প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স-এর কলেজ শাখায় ভর্তি হন এবং ১৮৭৭ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এফ.এ (বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক) পাশ করেন। ১৮৮০ সালে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু দ্বিতীয় বিভাগে বি.এ পাশ করেন। ১৮৮৩ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট কলেজ থেকে পদার্থ, রসায়ন ও উদ্ভিদবিজ্ঞানে ট্রাইপোসসহ অনার্স পাশ করেন। ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের অফিসিয়েটিং প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন।

১৮৮৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজের ছাত্রী অবলাদাস কে বিয়ে করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি বিজ্ঞান গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৯৫ সালে মাইক্রোওয়েভ সৃষ্টিতে এবং বেতার সংক্রান্ত পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন। ১৮৯৬ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এসসি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৯৭ সালের ২৯ জানুয়ারি রয়্যাল ইনস্টিটিউটে প্রথম বারের মত বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বছরেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সাথে বন্ধুত্ব তৈরী হয়। ১৮৯৯ সালে ফটোভলটিকসেল ও কৃস্টাল রেকটিফায়ার আবিস্কার করেন। তার আগে ১৮৯৫ সালে নিজস্ব পদ্ধতিতে X-ray আবিস্কার করেন। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু তার জীবনের এই পর্বে যে সকল গবেষণা পত্র রচনা করেছেন তা পরবর্তীতে অনেক যুগান্তকারী আবিষ্কারের বীজ এতে নিহীত ছিল। ১৯০০-১৯০২ সাল পর্যন্ত কাজগুলো একত্রিত করে " Response in the living and nonliving" নামে একটি বই প্রকাশ করেন। তিনি সর্বমোট ১৪ টি গ্রন্থের রচয়িতা। 'অব্যক্ত' বাংলা ভাষায় লেখা তার একমাত্র বই। ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ সরকার স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু কে আই.সি.ই উপাধি প্রদান করেন। ১৯০৬ সালে বৈজ্ঞানিক সফরে জার্মানী গমন করেন। ১৯০৮ সালে প্রথম বারের মত তিনি আমেরিকা যান এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯১১ সালে তিনি মংমনসিংহ বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই

বছরেই ব্রিটিশ সরকার তাকে C.S.I (Companionship of the star of India) খেতাবে ভূষিত করে। ১৯১২ সালে তার চাকরীর বয়সসীমা শেষ হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তাকে আরও দুই বছর চাকরী এক্সটেনশন করে। ১৯১৪ সালে মহামতি গোখলের অনুপ্রেরণায় ও আর্থিক সাহয্যে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু বৈজ্ঞানিক সফরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯১৫ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর পর ৫ বছরের জন্য তাঁকে এমেরিটাস প্রফেসর হিসেবে এক্সটেনশন দেয়া হয়। ১৯১৭ সালে তিনি তার জীবনের সবচেয়ে মহৎকীর্তি বসু বিজ্ঞান মন্দির (Bose Institute) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে নাইট উপাধি বা স্যার উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯১৭ সালে তিনি ক্রেস্কোগ্রাফ আবিস্কার করেন। ১৯২০ সালে রয়েল সোসাইটি তাকে ফেলো নির্বাচিত করেন। এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে এই বছর সন্মান সূচক ডি.এসসি প্রদান করে। ১৯২৩ সালে তিনি জেনেভায় বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। জর্জ বানার্ড শ' এই বছর তার প্রকাশিত গ্রন্থাবলী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু কে উপহার দিয়ে লেখেন " From the least to greatest Biologist". রোমা রোলাঁ তাঁর 'জাঁ ক্রিস্তস্ক' জগদীশ কে উপহার দিয়ে লেখেন "To the Revealer of a new world " . ১৯২৮ সালে তার সত্তর বছরপূর্ণ হয়। ১লা ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে তার সত্তর বছর পূর্তি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই বছরেই মিশর সরকার তাকে সবংর্ধনা প্রদান করেন। ১৯২৯ সালে ফিনল্যান্ড বিজ্ঞান একাডেমী তাকে সদস্যপদ প্রদান করেন। ১৯৩১ সালে নেতাজি সুভাষ চন্দ্রবসুর উদ্যোগে কলকাতা পৌরসভা তাকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করেন।

১৯৩৩ সালে হিন্দু কাশী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে অনারারী ডি.এসসি ডিগ্রী প্রদান করেন। ১৯৩৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ তাকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি.এসসি ডিগ্রী প্রদান করেন কিন্তু গুরুতর অসুস্থতার কারণে তিনি সেই সময় ঢাকায় আসতে পারেননি। ১৯৩৭ সালের ২ শে নভেম্বর মঙ্গলবার সকাল ৮টায় বিহারের গিরিডি শহরে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পরলোকগমন করেন। ২ শে নভেম্বর কোলকাতার পার্ক সার্কাস ক্রিমেটোরিয়ামে তাঁর মরদেহ দাহ করা হয়। ব্যক্তিগত জীবনে বসু নি:সন্তান ছিলেন। পৃথিবীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জার্ণাল নেচারে (Nature) এবং Proceedings of the Royal Society -তে তাঁর চারটি গবেষণা পত্র ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতের মহান অবিসংবাদিত নেতা মহাত্মা গান্ধী বসু মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য রেখেছিল প্রশংসনীয় ভূমিকা। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু কে তিনি এক চিঠিতে লেখেন-" I remember how promint a part of you took in the foundation of the institute eleven years ago..". বসু বিজ্ঞান মন্দির স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু কাছে শুধু গবেষণাগার নয়, ছিল উপাসনালয়। তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল প্রবল। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত ছিলেন এবং বৈদান্তিক মতে ছিলেন বিশ্বাসী। খুব সকালে তিনি নিয়মিত প্রার্থনা করতেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের মুদ্রিত আরাধনা পাঠ করতেন ভক্তি সহকারে। তিনি প্রতিদিন ভক্তিসহকারে উপনিষদ পাঠ করতেন এবং " বহুর মধ্যে এক কে যিনি জানেন তিনিই সত্য জেনেছেন , অন্যেরা নয়" এই বাক্যটি ছিল তাঁর খুব প্রিয়। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু ছিলেন ব্যাক্তিগত ভাবে অত্যন্ত কঠিন চরিত্রের অধিকারী এবং ন্যায় নিষ্ঠ ; যা তাঁর নিম্নে উল্লেখিত বাণীতে সুস্পষ্ট-

- আমাকে যদি শতবার জন্ম গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকবার হিন্দুস্থানে জন্ম গ্রহণ করিতাম।
- সমুদয় শিক্ষা-দীক্ষা কোন মনুষ্যত্বলাভের উদ্দেশ্য মাত্র। বিশ্বব্যাপী চিরকাল দুর্বল উচ্ছিন্ন হইবে এবং সবল প্রতিষ্ঠিত হইবে।
- স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে। যদি বাঁচিতে চাও তবে কশাঘাত করিয়া নিজেকে জাগ্রত রাখো।
- জগতে ভিক্ষুকের স্থান নাই।
- যদি আমার জীবনে কোন সফলতা হইয়া থাকে তবে তাহা নিস্ফলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।
- অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়।
- আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, সঞ্চয় করিতে হইবে এবং বাড়িতে হইবে।
- সামান্য ধূলি কণাও বিনষ্ট হয় না, ক্ষুদ্র শক্তিও বিনাশ পায় না। শক্তিতেই চরমোচ্ছাস।
- অদৃষ্ট দারুন আঘাত দিয়া মানুষ কে পরীক্ষা করে , সাচ্চা ও ঝুটার পরীক্ষা কেবল তখনই হয়।

স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু শুধু বিজ্ঞানী ছিলেন না , ছিলেন একজন ভাল মানের সাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্ম্পকে বলেছেন, তিনি যদি বিজ্ঞানী না হতেন তাহলে বাঙলা সাহিত্য একজন ভাল লেখক কে পেত। রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর দীর্ঘদিন বন্ধুত্বের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল এবং

তাদের মধ্যে প্রচুর চিঠি আদান প্রদান হতো, যা বর্তমানে বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু গল্পও লিখেছেন এবং গল্প লিখে তিনি "কুন্তলীন" সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এই পুরস্কার পেয়েছেন। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু " উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু" নামে একটি বাংলায় প্রবন্ধ লিখেছেন তার কিছু অংশ ছোট পাঠক বন্ধুদের জন্য এখানে তুলে ধরা হলো-" আমরা যেমন আহার করি তেমনি উদ্ভিদও আহার করে। আমাদের দাঁত আছে , আমরা কঠিন জিনিস খাইতে পানি। ছোট শিশুদের দাঁত নাই , তাহারা শুধু দুধ খায়। গাছেরও দাঁত নাই , সুতরাং তাহরা কেবল জলীয় দ্রব্য কিংবা বাতাস হইতে আহার গ্রহণ করিতে পারে। মূল দ্বারা গাছ মাটি হইতে আহার গ্রহণ করিতে পারে। চিনিতে জল ঢালিলে চিনি গলিয়া যায়। মাটিতে জল ঢালিলে অনেক জিনিস গলিয়া যায়। গাছ সেই সব জিনিস আহার করে। গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছের আহার বন্ধ হইয়া যায় এবং গাছ মারা যায়। অণুবীক্ষণ দিয়া অতি ক্ষুদ্র পদার্থও দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের ডাল কিংবা মূল এই যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, গাছের মধ্যে হাজার হাজার নল রহিয়াছে। এই সকল নল হইতে গাছের শরীরে রস প্রবেশ করে।

এছাড়াও গাছের পাতা বাতাস হইতে আহার সংগ্রহ করে। পাতার মধ্যে অনেক গুলো ছোট ছোট মুখ রহিয়াছে। অণুবীক্ষণ দিয়া এই সকল মুখে ছোট ছোট ঠোঁট দেখা যায়। যখন আহার করিবার আবশ্যক হয় না তখন ঠোঁট দুটি বুজিয়া থাকে। আমরা যখর শ্বাস প্রশ্বাস করি তখন এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়; তাহাকে অঙ্গারক বায়ু বলে। ইহা যদি পৃথিবীতে জমিতে থাকে তবে সকল জীবজন্তু অল্প দিনের মধ্যে এই বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া মরিয়া যাইবে। বিধাতার করুনার কথা ভাবিয়া দেখ। যাহা জীব জন্তুর পক্ষে বিষ, গাছ তাহাই আহার করিয়া বাতাস পরিস্কার করিয়া থাকে। গাছের পাতার উপর যখন সূর্যের আলোক পড়ে তখন পাতাগুলি সূর্যের তেজের সাহয্যে অঙ্গারক বায়ু হইতে অঙ্গার বাহির করিয়া লয়। এই অঙ্গার গাছের শরীরে প্রবেশ করিয়া গাছকে বাড়াইয়া থাকে। গাছেরা আলো চায়, আলো না হইলে তাহারা বাঁচিতে পারে না। গাছের সর্ব প্রকার চেষ্টা কি করিয়া একটু আলো পাইবে। যদি জানালার কাছে টব রাখ তবে দেখিবে, সমস্ত ডালগুলি অন্ধকার ছাড়িয়া আলোর দিকে যাইতেছে। .... গাছ আলো

খাইয়া বাঁচে আমরাও আলো খাইয়া বাঁচি, কারণ উদ্ভিদ ছাড়া আমরা বাঁচিতে পারি না। "

সহায়ক গ্রন্থ-
জীবনী গ্রন্থমালা জগদীশ চন্দ্র বসু সালাম আজাদ
বাংলা একাডেমি , ঢাকা।

লিটন চন্দ্র মহন্ত
কবি ও গল্পকার
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা,খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট
বিসিএসআইআর। ঢাকা।

মোবাইল বা সেলুলার ফোনের তেজস্ক্রিয়তা ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা

শেখ মোঃ নূরুল ইসলাম

সেলুলার বা মোবাইল ফোন তথ্য প্রযুক্তি ও বেতার যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর একটি অন্যতম বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক অবদান। সাধারনত আমরা বাংলাদেশে যে সব মোবাইল ফোন দেখি বা পরিচিত আছে; তা ছাড়া আরো উন্নত প্রযুক্তির সেলুলার কৃত্তিম উপগ্রহ ভিত্তিক ফোন ও ধনী দেশ গুলিতে ব্যবহৃত হয়। এমন কি ঐ প্রযুক্তিতে চলামান ছবিও দৃশ্য আদান প্রদান করা য়ায়।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল ও গরীব দেশে যেখানে যোগাযোগ আবকাঠামো ও টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো সর্বজনীন হয় নাই বা সর্বসাধরণের জন্য তৃনমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভরপর হয় নাই। সে ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের আবির্ভাব ও ব্যবহার বেতার যোগাযোগ ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধন করেছে। এই প্রযুক্তি বিকাশে ও ব্যবহারে সরকারী অনুমোদন, সহযোগিতা ও সর্বোপরি বেসরকারী উদ্যোগ ও উপস্থিতি সত্যিই প্রসংশারদাবীদার। আজ এই মোবাইল ফোনের কল্যাণে বড় বড় শহরে অবস্থিত আত্মীয়-স্বজনরা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলে অবস্থানরত তাদের আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজখবর যে কোন সময় জানতে পারছেন এবং নিশ্চিন্তে থাকতে পারছেন। এমন কি আই.এস.ডি সুভিধা সম্পন্ন মোবাইল সেট দিয়ে নিবীড় পল্লী থেকে লোকজন বিদেশে অবস্থানরত তাদের আতীয় স্বজনদের সঙ্গে স্বল্প খরচে কথাবর্তা বলে উপকৃত ও আনন্দিত হচ্ছেন। কিন্ত

কিছু প্রশ্ন আছে। একটি হলো কিছু সমাজ বিরোধী লোক কর্তৃক এর অপব্যবহার এবং অন্যটি হলো কিছু ফোনের স্বাস্থ্যের সমস্যা। মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে যে কারণে এই স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি হয়, সে বিষয় কিছু বলা প্রাসঙ্গিক। মোবাইল ফোনের একমাত্র ও ঝুকিপূর্ণ সমস্যা হলো এর তেজস্ক্রিয়তা । যখন আমারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করি তখন ফোন সেটটি থেকে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি নামক এক প্রকার তেজস্ক্রিয় কম্পন সৃষ্টি হয়, আর সেটাই হলো স্বাস্থ্য সমস্যার মূল কারণ।

গবেষণাগারে ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বেশী পরিমাণের ও অধিক সময় রেডিও ফিকোয়েন্সি জাতীয় তেজস্কক্রিয়তার প্রভাবে ইঁদুরের অনেক ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন কর্কট রোগ বা ক্যান্সার, গর্ভপাত, রক্তের ক্যান্সার, শারিরিক ও মানসিক অবসাদ, তীব্র মাথাব্যাথা ইত্যাদি। তবে এখানে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট হওয়া দরকার যে অল্প পরিমাণে ও স্বল্প সময় এই তেজষক্রিতার প্রভাবে ইঁদুর বা মানুষ কারো উপরই তেমন কোন খারপ প্রভাব পড়ে না। সাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিচালিত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এটা আজ প্রায় নিশ্চয়তার সঙ্গে প্রমানিত হয়েছে বা হচ্ছে যে আমরা মোবাইল ফোন ব্যাহারকারীরা যে পরিমাণে ও এত অল্প সময় এই তেজষক্রিতার সম্মূখীন হই তাতে আমাদের কোন বড় ধরনের ক্ষতি হয় না। কিন্তু এটাও পাশাপাশি বলা দরকার যে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর উল্লেখিত সব স্বাস্থ্য সমস্যা হওয়ার প্রবণতা যারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেনা তাদের থেকে বেশী।

এবার আমরা দেখবো মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর কি কি স্বাস্থ্য সমস্যা হয় যারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে না, তাদের থেকে বেশী।

১. মস্তিস্ক স্যালাইভারী গ্রন্থির ক্যান্সার
২. রক্তের ক্যান্সার
৩. চোখে ছানি পড়া
৪. ঘুমের সমস্যা এবং মানসিক অস্থিরতা ও চাপ
৫. কোন কোন ক্ষেত্রে আচারণগত সমস্যা

৬. গর্ভবতী মায়েদের গর্ভস্থ শিশুর বিকাশে অপরিপূর্ণতা ও কোন কোন ক্ষেত্রে গর্ভপাত

৭. জিন বা ডি.এন.এ-এর বিন্যাসে জটিলতা ক্যালসিয়াম পরিসংখ্যান অসুবিধা

৮. মন সংযোগে সমস্যা ও তীব্র মাথা ব্যাথা

৯. খুব অল্প বয়সী শিশু ব্যবহার কারীর স্নায়ুতন্ত্র বিকাশে সমস্যা

১০. চলন্ত যান বাহনে চালকের মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে মনসংযোগের অভাব ঘটে, আর সেই কারণে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে।

শেখ মোঃ নূরুল ইসলাম
১২০ ইসলাম ভিলা, পরিচালক স্কুল সড়ক,
নতুন বাজার, বরিশাল।

পরিবেশ বিপর্যয়

মোঃ ইছাহাক মোল্লা

যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মানুষ বসবাস করে তাই মানুষের পরিবেশ। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলতে আমাদের চারপাশের আকাশ, বাতাস, মাটি, পানি, গাছ-পালা এবং পশু-পাখিকে বোঝায়। কোন একটি জীব পরিবেশের আনুকূল্য ছাড়া এককভাবে বাঁচতে পারে না। একটি জীবন পরিবেশের অঙ্গ হিসেবে কোন না কোন দিক দিয়ে অন্যের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতিতে স্বাভাবিক যে পরিবেশ বিদ্যমান তাই প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান জড় ও জীব এই উভয়ই হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, জড় পদার্থ এবং বিভিন্ন প্রজাতির জীব সমন্বিতভাবে কোনো এলাকার একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলে। অতীতে পৃথিবীর আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ফলে অনেক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে, যেমন-ডাইনোসর। এই প্রাণীর বিলুপ্তির সুনির্দিষ্ট কারণ জানা না গেলেও বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে পরিবেশগত কারণেই এদের বিলুপ্তি ঘটেছে। একটি প্রচলিত জনপ্রিয় মতবাদ আছে যে, দীর্ঘদিন অতিকায় উল্কা বৃষ্টিতে পৃথিবী মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে সূর্যের আলোকবিহীন অবস্থায় পৃথিবীর উদ্ভিদকূল বিনষ্ট হয়ে যায় এবং খাদ্যাভাবে ডাইনোসর মারা যায়। পরিবেশকে কয়েকটি ভাগে বিবেচনায় এনে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা হলো:

১। প্রাকৃতিক পরিবেশ

প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশকেই প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিবেশের উপর ব্যাপক ও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যেমন-ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসঃ ঘূর্ণিঝড়-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ সাইক্লোন (Cyclone)।

সাইক্লোন শব্দটি গ্রিক শব্দ কাইক্লোস (Kyklos) থেকে উৎপত্তি, যার অর্থ সাপের কুন্ডলী। সাইক্লোনের গঠন সাপের কুন্ডলীরমতোই দেখতে। বিশ্ব জুড়ে নিরক্ষীয় ঘূর্ণিঝড় প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৮০টির মত সৃষ্টি হয়। মোট সংখ্যার প্রায় শতকরা ৪ ভাগ বঙ্গোপসাগরে উৎপত্তি হয়। নিরক্ষীয় ঘূর্ণিঝড়ের গঠন, তীব্রতা ও কাঠামো কয়েকটি জলবায়ুগত বিষয়ের সাথে জড়িত থাকে। যেমন-

১. আপেক্ষিক ঘূর্ণায়নের নিম্নস্তর
২. করিওলিস প্যারামিটার
৩. সমুদ্র তাপশক্তি
৪. পৃষ্ঠ ও ৫০০ মিটারের সম্ভাব্য তাপমাত্রার উলম্ব নতি এবং
৫. মধ্য ট্রপোস্ফিয়ারের আপেক্ষিক আর্দ্রতা।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঘূর্ণিঝড়ের অর্থ হলো নিম্নচাপ সম্পন্ন এলাকা যেখানে কেন্দ্রকে ঘিরে উত্তর গোলার্ধে বাতাস ঘোরে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী ও দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় বিষুবরেখা অতিক্রম করে না। এ ঝড় প্রকৃতপক্ষে একই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমেরিকার আটলান্টিক তীর অঞ্চলে একে বলে হ্যারিকেন, দূরপ্রাচ্যে টাইফুন, ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে সাইক্লোন নামে চিহ্নিত।

ঘূর্ণিঝড় প্রায় প্রতি বছরই বাংলাদেশে আঘাত হানে। কোন কোনটি দেশের উপকূলীয় এলাকায় মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। ১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসে জলোচ্ছ্বাসহ যে ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত হানে, তাতে মারা গেছে প্রায় ৫ হাজারেরও বেশি মানুষ এবং ১ লক্ষেরও বেশি গবাদিপশু। এ ঘূর্ণিঝড়ের ছোবলে সুন্দরবন ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত হয়। বাঘ, হরিণ, বানরসহ বহু প্রজাতির প্রাণীর অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে। ১৯৯০ সালের জলোচ্ছ্বাসেও বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং বহুপ্রাণী ও সম্পদের ক্ষতি হয়। ১৯৭০ সালে উপকুলীয় এলাকায় এবং সর্বশেষ ১৫ নভেম্বর ২০০০ সালে সিডরেও ব্যাপক প্রাণহানীসহ পশুপাখি, জীবজন্তু ও সম্পদের ক্ষতি হয়। বাংলাদেশ মূলত একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রায় প্রতিবছরই, প্রাকৃতিক

দুর্যোগ যেমন, বন্যা, মুষলধারে বৃষ্টি, নদীভাঙ্গন জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন ইত্যাদি লেগেই থাকে। গত ১০০ বছরে ৫০৮টি সাইক্লোন উৎপত্তি হয় বঙ্গোপসাগরে, এর ১৭% আঘাত হানে বাংলাদেশে। বর্তমানে সতর্ক সংকেত বা পূর্বাভাস পূর্বে থেকে প্রচার করায় মানুষ কিছুটা বেঁচে গেলেও পশুপাখি, জীবজন্তু ও সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে ব্যাপক আকারে।

কালবৈশাখী ঃ এ অঞ্চলে সাধারণত চৈত্র-বৈশাখ মাসে কালবৈশাখীর প্রচন্ড থাবা শুরু হয়। এই সময় দেখা যায় দুপুরের পর হঠাৎ আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায় এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রচন্ড বেগে ঝড় বইতে থাকে। এর সাথে শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত। কখনো শিলাবৃষ্টি। কালবৈশাখী ঝড় অধিকাংশ সময় বিকাল থেকে রাত নটার মধ্যে ঘটে। এ ঝড়ের গতিবেগ ঘন্টায় ১০০-১৩০ কিলোমিটারের মধ্যে থাকে। যদিও অনেক সময় গতিবেগ ঘন্টায় ১৬২ কিলোমিটারে অতিক্রম করে। কালবৈশাখীর প্রভাবে বনজ সম্পদ, ঘরবাড়ী, গবাদিপশু, ফসল ও মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

বন্যাঃ বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হচ্ছে। সাম্প্রতিককালের বন্যার তীব্রতা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের পানির উৎসস্থল ভারত, নেপাল, ভুটান ও তিব্বত। বাংলাদেশের নদীগুলোর অববাহিকা প্রায় ৬ লক্ষ বর্গমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। হিমালয়ের পাদদেশগুলোতে প্রচুর বৃষ্টি হয়। বর্ষা মৌসুমে প্রতিবেশী দেশ থেকে পানি বয়ে এনে বঙ্গোপসাগরে পৌঁছানোর সময় নদীগুলোর ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে প্রায় সমস্ত বাংলাদেশ বন্যায় প্লাবিত হয়। আবার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের অপেক্ষাকৃত উচ্চ পানিতল পানি অপসারণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সাগরের সৃষ্ট জোয়ারের পানির চাপের পরিমাণ নদীগুলোর পানি চাপ থেকে কমপক্ষে ৫ গুণ বেশি থাকে। এর ফলে নদীর পানির নিম্নগামী স্রোতে বাধার সৃষ্টি হয়ে নদীর দুকূল প্লাবিত হয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। প্রতিবছর বাংলাদেশে বন্যার কারণে কোটি কোটি টাকার ফসলসহ সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে।

খরাঃ দীর্ঘ সময় ধরে স্বল্প বৃষ্টিপাত বা সম্পূর্ণ বৃষ্টির অভাবে খরা সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রয়োজন মেটাতে পানির অভাব ঘটে এবং গাছপালা বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় মাটির আর্দ্রতা সন্তোষজনক পর্যায়ে থাকে না। এতে পানির স্তরের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। ফলে পানির অভাব, শস্যহানি, নদীর জলস্রোতের তীব্রতা হ্রাস, মাটির নিচের পানির স্তর অবনমন এবং মাটির আর্দ্রতা হ্রাস দেখা দেয়। খরার সময় বৃষ্টিপাতের তুলনায় অধিকহারে পানি বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং খরা পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে ফসল উৎপাদন ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের খরা পরিস্থিতি ছিল প্রকট। উৎপাদন প্রায় শতকরা ৪২.০২% পর্যন্ত হ্রাস পায়।

সুনামী ঃ সম্প্রতিকালে জাপানে ঘটে গেল বিশ্বের সর্ববৃহত্তম সুনামি। জাপানের টোকিওতে গত ১১ মার্চ ২০১১ সালে আঘাত হানে এই প্রলয়কারী সুনামী। সমুদ্রের তলদেশে ৮.৯ মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ায় প্রায় ১০ মিটার

পরিবেশ বিপর্যয়-এর অংশ সুনামী

উচ্চতা বিশিষ্ট জলোচ্ছ্বাস ৮০ মাইল এলাকা ব্যাপী প্লাবিত করে। আমরা টেলিভিশন ইমেজে অনেকেই তা দেখতে পেরেছি। কিভাবে বড় বড় সমুদ্র জাহাজ, দালান-কোটা ঘর, বাড়ী ইত্যাদি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে

গাড়ীগুলোকে যেভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তা দেখে মনে হচ্ছিল এসব বুঝি খেলনা গাড়ী বা হালকা সোলার তৈরি। এ সুনামীর কারণে জাপানের পারমাণবিক চুল্লিরও অনেক ক্ষতি হয়েছে। অনাকাঙ্খিতভাবে যদি কোন পারমাণবিক চুল্লি বিস্ফোরণ ঘটত তবে আবারও হিরোশিমা বা নাগাসাকির মত বড় কোন মানবিক বিপর্যয় জাপানসহ সারা বিশ্বাবাসীকে দেখতো হতো। সুনামী এশিয়ার অনেক দেশেই হয়ে থাকে। বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশসমূহে বেশী হয়। এছাড়াও আমেরিকাতে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে এ সুনামীতে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ভূমিকম্প ঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ভূমিকম্পও পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায়। ভূ-অভ্যন্তরে দ্রুত বিপুল শক্তি মুক্ত হওয়ায় পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে ঝাঁকুনি বা কম্পনের সৃষ্টি হয় তাকে ভূমিকম্প বলা হয়। ভিত্তিশীলা চ্যুতি বা ফাটল বরাবর আকস্মিক ভূ-আলোড়ন হল ভূমিকম্প। হয় বা আগ্নেগিরির লাভা

প্রচন্ড শক্তিতে ভূ-অভ্যন্তর থেকে বের হয়ে আসার সময়ও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। কম্পন শক্তি পরিমাপ করার যন্ত্রের নাম রিখটার স্কেল। ভূকম্পনের ফলে, ভূমিরূপের কোথাও ভাজ, ফাটল বা ধসের সৃষ্টি হয়। নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৭৮৭ সালে আসামে যে ব্যাপক ভূমিকম্প হয় তার ফলে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর তলদেশ কিছুটা উচু হয়ে যায়। ফলে নদীটির তার গতিপথ পরিবর্তন করে বর্তমানে যমুনা নদী দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার আওতাভুক্ত।

আগ্নেয়গিরিঃ

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। ভূ-অভ্যন্তরের তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বের হওয়া প্রচন্ড উত্তাপ অশ্মমন্ডলীয় শিলার নিম্নভাগ গলে ম্যাগমার সৃষ্টি হয়। ভূ-অভ্যন্তরের এই গলিত শিলা অশ্মমন্ডলের ফাটল বা দুর্বল অংশ ভেদ করে ভু-পৃষ্ঠের লাভা উদগীরণ করে। এই লাভা ক্রমাগত ফাটল বা উদগীরণ মুখের চারদিকে জমা হয়ে যে উঁচু ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়

তাকে আগ্নেয়গিরি বলে। পৃথিবীতে সক্রিয় আগ্নেয়গিরির সংখ্যা ৮৫০টি। অনেক আগ্নেয়গিরির লাভা, ভস্ম ও ধূলিকণা ঊর্ধ্বআকাশে ছড়িয়ে সূর্যরশ্মির আপাতন মাত্রা হ্রাস ঘটিয়ে শীতলতা বৃদ্ধি করে।

১.২ কৃত্রিম পরিবেশঃ

জড় ও জীবের মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনরূপ স্খলন ঘটলেই কৃত্রিম পরিবেশের জন্ম হয়। মানুষের ক্রমবিকাশের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়ে যে নতুন পরিবেশের জন্ম ঘটায় তা-ই কৃত্রিম পারিবেশ বা মানুষের সৃষ্ট পরিবেশ। উদাহরণ স্বরূপ, শহর নগর, বন্দর, পার্ক, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি। পৃথিবীব্যাপী মানুষের বিচরণ ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণের সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হতে থাকে। মানুষের সুবিধার জন্য পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিতভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের রূপান্তর ঘটিয়ে মানুষ সৃষ্টি করে কৃত্রিম পরিবেশ। গড়ে উঠে নগর, কৃষি, শিল্প কারখানা, ইত্যাদি। বর্তমান পৃথিবীতে বড় ধরনের যতগুলো পরিবেশ বিপর্যয় ঘটেছে তার অধিকাংশের জন্যই এ বিশ্বের সভ্যসমাজের মানুষই

দায়ী। জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য আমরা প্রকৃতির আবাসসমূহকে নষ্ট করছি। যেমন পাহাড় কাটা, নদী খালবিল ভরাট বা বাঁধ দেয়া, বনভূমি উজাড় করা। এভাবে বায়োডাইবারসিটি বিপর্যয়ে পতিত হচ্ছে। এছাড়া কৃষিতে অধিকহারে সার ও কীটনাশক ব্যবহার, ইটের ভাটা ও শিল্প কলকারখানায় অতিরিক্ত কার্বন নির্গমন ফ্রিজ ইয়ারকুলার ব্যবহার, ভূমিতে অতিরিক্ত বহুতল ভবন নির্মাণ ইত্যাদি কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বাড়তি চাপ দিন দিনই বাড়ছে। সম্প্রতি যুদ্ধেক্ষেত্রে পারমাণবিক বোমা নানা প্রকার কেমিক্যাল বোমাসহ অনেক ক্ষতিকর দ্রব্যাদি ব্যবহৃরিত হচ্ছে। এসব কারণে প্রকৃতিতে স্বাভাবিক পরিবেশ থাকছে না। গ্রীণহাউস গ্যাসের বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ই বাড়ছে যার জন্য মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ছে। মানবসৃষ্ট কারণেই বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশ্বের প্রাণীকূলের জন্য এটা হুমকিস্বরূপ।

১.৩ সামাজিক পরিবেশঃ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তাই তার সামাজিক পরিবেশ সুষ্ঠু ও সুন্দর হওয়া আবশ্যক। একটি সমাজের প্রকৃতি, রীতি,

মূল্যবোধ, বিশ্বাস বা প্রচলিত ধারণা এবং নৈতিকতাভুক্ত সমাজ পরিবারের কাজের উপর নির্ভর করে। কয়েকটি পরিবার নিয়ে পরিবার বা গোষ্ঠী গঠিত হয়। এ ধররেন কয়েকটি পরিবার বা গোষ্ঠী যখন কোন স্থানে কোন সময়ে মিলেমিশে বাস করে তখন তাদের একত্রে সম্প্রদায় বলা হয়। একটি ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে কতগুলো সম্প্রদায় একত্রে বসবাস করলে তাদের সমষ্টিকে সমাজ বলে। সমাজের বিভিন্ন বিভাগ বা গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের যে সুষম আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের জীবন প্রণালীর অবস্থা সম্পর্কে ধারণা জন্মায়, তাকে সামাজিক পরিবেশ বলা হয়। সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত।

১.৪ পরিবেশ বিপর্যয়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনাঃ

মিয়ামাতা বিপর্যয় ঃ ১৯৫৫ সালে জাপানের মিয়ামাতা সমুদ্রের উপকূলবর্তী গ্রামের মানুষ বিশেষ করে জেলে সম্প্রদায় বিষাক্ত মাছ খেয়ে অপরিচিত রোগের প্রকোপে অনেক মানুষ বিকলাঙ্গ হয় ও কিছু মানুষ মারা যায়। এক গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, মিয়ামাতা উপসাগরের তীরে

কষ্টিক সোডা রাসায়নিক কারখানার বর্জ্য নিয়মিত মিয়ামাতা উপসাগরে নির্গত করা হতো এবং মাছ সাগরের বিষাক্ত মার্কারিযুক্ত এই রাসায়নিক বর্জ্য খেয়ে দেহে দেহে মার্কারি স্তুপীকৃত করতে সক্ষম। সাগরের তীরের মানুষ মার্কারি দুষ্ট মাছ খেয়ে বিষাক্রান্ত হয়। মার্কারির বিষক্রিয়ায় সৃষ্টরোগ মিয়ামাতা রোগ (Miuamata Disease) নামে পরিচিত। একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ যে, জাপানে মিয়ামাতা রোগে প্রায় ১০ হাজার লোক আক্রান্ত হয়, প্রাথমিকভাবে ৬৩ জন লোক মারা যায় এবং বহুলোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে বিকলাঙ্গ হয়।

ভূপাল ট্র্যাজেডিঃ ভারতের ভূপালের কীটনাশক কারখানা থেকে মিথাইল আইসোসায়ানেট (মিগ) গ্যাস (অতিশয় বিষাক্ত উদ্বায়ী ও দাহ্যরাসায়নিক পদার্থ) নিঃসৃত হয়ে কারখানা-সংলগ্ন অধিবাসীদের উপর যে ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী মরণক্রিয়া ঘটেছিল, তাকেই "ভূপাল ট্রাজেডি" বলা হয়। ঘটনাটি

ঘটে ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। মিক গ্যাস নিজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়ায় প্রচুর তাপ উৎপন্ন করতে পারে। বিস্ফোরণ ধর্মের জন্য মিগ পদার্থকে স্টেনলেস স্টিলের ট্যাঙ্কে শূন্যডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সঞ্চিত রাখা হয়। দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে উল্লেখ রয়েছে যে, দুর্ঘটনার রাতে কিছু সময় মিগ রক্ষিত ফ্রিজার বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে মিগ তরল আকারে বেরিয়ে বায়ুর সংস্পর্শে এসে বিস্ফোরিত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। এ দুর্ঘটনায় প্রায় ২৫০০ মানুষ মারা যায় এবং ২ লক্ষেরও বেশিলোক পঙ্গুত্ব বরণ করে।

চেরনোবিল দুর্ঘটনাঃ

সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের দুর্ঘটনাকে চেরনোবিল দুর্ঘটনা বলে। চেরনোবিল কেন্দ্রে ইউরেনিয়াম জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হতো। দুর্ঘটনার ঠিক আগের রাতে পারমাণবিক চুল্লির নিরাপদ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল। নিরাপদ ব্যবস্থার অনুপস্থিতির প্রথম সুযোগেই পারমাণবিক চুল্লির জ্বালানি অতিউত্তপ্ত হওয়ায় বিস্ফোরণটি ঘটে। কিন্তু নিরাপদ চুল্লির বিস্ফোরণে কেন্দ্রে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষ ও বিজ্ঞানী এবং কেন্দ্রের নিকটবর্তী বহুলোক মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়। কয়েক মাসের মধ্যে ৩১ জন লোক মারা যায় ও বহুলোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া ২টি বিশ্বযুদ্ধ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মানুষ ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হলেও পরিবেশের উপর এর প্রভাব সে ভাবে আলোচনায় আসেনি। যতটা ক্ষতি হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বড় বিপর্যয় হলো জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকার পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ। প্রথম বোমাটি ফেলা হয়েছিল হিরোশিমায় ৬ আগস্ট, ১৯৪৫ যার নাম ছিল 'লিটল বয়' এরপর 'ফ্যাটঅ্যান' নামে ৯ আগস্ট ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় নিউক্লিয়ার বা পারমাণবিক বোমাটি ফেলা হয় নাগাসাকিতে। শুধু মানুষই মরে ছিল হিরোশিমায় প্রায় ৯০,০০০-১,৬৬,০০০ জন এবং ৬০,০০০-৪০,০০০ মরেছিল নাগাসাকিতে এর অর্ধেকই মরেছিল প্রথম দিনেই। জাপানের স্বাস্থ্য বিভাগের হিসেবে ৬০ ভাগ মানুষ মরেছিল আগুনে ঝলসানোর কারণে ৩০% ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ বা ধ্বংসাবশেষে চাপা পড়ে এবং ১০% অন্যান্য বিভিন্ন কারণে। আমেরিকার হিসাব মতে ১৫-২০% রেডিয়েশনের কারণে বা তেজস্ক্রিয়তায়, ২০-৩০% আগুনে ঝলসানোর কারণে এবং ৫০-৬০% নানাবিধ

আঘাতজনিত কারণে। এছাড়াও পারমাণবিক বোমার ভয়াবহতা ২/৩ প্রজন্ম পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে জন্মাগ্রহণ করা শিশুরাও এর ভয়াবহতার চিহ্ন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যেমন, বিকলাঙ্গ, মানসিক ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি সমস্যা দেখা যায়।

১.৬ পরিবেশ সংরক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণঃ মানুষ তাঁর নিজের ক্ষণস্থায়ী স্বার্থে পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলছে। এই সংকটপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিবেশকে সংরক্ষণের করণীয় হতে পারে-

১. বন ও বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ, ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ ও চারণভূমিতে ঘাস লাগানো, সামাজিক ও পারিবারিক বনায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ।
২. রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নিযন্ত্রণ ও জৈবসারের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
৩. পরিবেশ সংরক্ষণে রাজনৈতিক অঙ্গীকার সুনিশ্চিত করা।
৪. প্রাকৃতিক শক্তি যেমন, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং অন্যদিকে কাঠ, কয়লা ও তেল পোড়ানো হ্রাস।
৫. শিল্প এলাকায় শিল্পকারখানা গড়ে তোলা এবং আবাসিক এলাকাতে শিল্পকারখানা না করা। শিল্প বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ।
৬. পৌর, বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালি বর্জ্য নিরাপদে অপসারণ নিশ্চিত করা।
৭. পরিবেশ আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও পরিবেশ দুষণকারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান।
৮. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, বিশুদ্ধ ও নিরাপদ খাবারপানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিবেশ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার নিশ্চয়তা বিধান।

সর্বোপরি মানুষ হিসেবে পৃথিবীর সকল প্রাণীর জীবন, চারণ ও প্রাকৃতিক সৃষ্ট পাহাড়, পর্বত, নদীনালা বনকে সংরক্ষণে সচেতন হওয়া।

মোঃ ইছাহাক মোল্লা
সম্পাদক
বিসিএসআইআর, ঢাকা।

চেনা অচেনা ভেষজ ফল

সোফিয়া হোসেন

গোলাপজাম

প্রচলিত নাম : গোলাপজাম
ইংরেজি নাম : Rose Apple, Gulab Jamun
বৈজ্ঞানিক নাম : *Syzygum jambos* (Linn.) Alston.
পরিবার : Myrtaceae

গোলাপজাম মাঝারি না হলেও একেবারে ছোট ফল নয়। ফলটি বেশ রসালো এবং খাওয়ার সময় গোলাপের গন্ধ পাওয়া যায়। নামটা গোলাপজাম হলেও আদলে কালোজামের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য নেই। তবে একই পরিবারভূক্ত। বীজ থেকে আপনা আপনি গাছ হওয়ায় গ্রামে এক সময় অঢেল গাছ ছিলো। কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল সবই আকর্ষণীয়। বাংলাদেশের সর্বত্রই এই ফল পাওয়া যায়। তবে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন,

সিলেট, মৌলভীবাজার ও রাজশাহী এলাকায় গোলাপজাম বেশি উৎপাদন হয়ে থাকে। দক্ষিণ এশিয়াতেই গোলাপজামের উৎপত্তি স্থান বলে বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা। তবে আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ভারত ও মালয়েশিয়া গাছটির জন্মস্থান বলে ধরা হয়। পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়াযুক্ত সব দেশেই এই গাছটি হতে দেখা যায়। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে তাজা ও ছোট ফল হিসেবে এর বিশেষ সমাদর রয়েছে। ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েতনাম, বার্মা ও শ্রীলংকাসহ উষ্ণমণ্ডলের অনেক দেশেই গোলাপজাম জন্মাতে দেখা যায়।

গোলাপজাম মাজারি আকারের ঝাঁকড়া, চির হরিৎ এবং মসৃণ ও ধূসর বর্ণের কাণ্ড বিশিষ্ট লম্বাকৃতির গাছ। পাতা সরু লম্বা বল্লমাকৃতির ১১-২০× ২-৫ সে.মি, পত্র শীর্ষ ক্রমশ সরু ও শাখা শিরা ১০-১২টি। ফুল প্রান্তিক রেসিমের মতো সাইজ। ফল বেরি, ৩ সেমি লম্বা পাকলে সাদা হয়। পুংকেশর অসংখ্য থাকে এবং পুংকেশরের রঙই ফুলের রঙ প্রকাশ করে। এর ফল দেখতে গোলাকার অনেকটা নাসপাতির মতো চ্যাপ্টা, তিন থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার লম্বা। কাঁচা ফল সবুজ রঙের, পাকা ফল সাদাটে-সবুজ। ফলের জন্য এই গাছ লাগানো হয়। মার্চ মাসে ফুল হয়। ফল পাকে মে-জুন মাসে। মাঝে মাঝে একই সময়ে ফুল ও ফল দুটোই থাকে। শাঁস মিষ্টি, গোলাপ সুগন্ধি, রসাল ও স্পঞ্জের মতো। বীজের মাধ্যমে এর বংশবিস্তার করা হয়ে থাকে । তবে অঙ্গজ উপায়েও বংশবিস্তার করা যায়। ফলজ বৃক্ষ হিসেবে গোলাপজাম সুপরিচিত। অনেকেই বাড়ির আঙিনায় বা বাগান আকারে লাগিয়ে থাকে। আমাদের দেশে দু'ধরনের গোলাপজাম জন্মাতে দেখা যায়। একটি সাদা, অন্যটি সাদা লাল মিশ্রিত।

গোলাপজামের গন্ধযুক্ত রসালো ফলটি পুষ্টিমানের দিক থেকে ও স্বাদে অতুলনীয়। ফলের বীজ বেশ বড় কিন্তু আহারোপযোগী ফলের প্রতি ১০০ গ্রামে আমিষ ০.৭ ভাগ, শ্বেতসার ২৩ ভাগ, চর্বি ০.২ ভাগ, খনিজ লবণ ০.৫ ভাগ, ভিটামিন সি ৫৩ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম ১০ মিগ্রা, লোহা ০.৫ মিগ্রা, ভিটামিন বি$_১$ ০.০১ মিগ্রা, ভিটামিন বি-২ ০.০৫ মিগ্রা, ক্যারোটিন ১৪১ মাইক্রোগ্রাম এবং খাদ্যশক্তি ৩৯ কিলোক্যালরি।

ছাল, পাতা ফল ভেষজগুণসম্পন্ন। এতে সব রকম পুষ্টি উপাদানই অল্পবিস্তর রয়েছে। পাকা ফল লবণ মাখিয়ে ও চটকিয়ে ৩-৪ ঘন্টা রাখার পর নির্গত রস পানির সাথে মিশিয়ে পান করলে পাতলা দাস্ত, অরুচি, বমিভাব নিরাময় হয়। গাছের ছাল ও পাতা বহুমূত্র রোগে উপকারি। গোলাপজাম থেকে মিছরি, জ্যাম ও জেলী তৈরি করা যায়। ফল ব্রেইন টনিক বা মস্তিষ্ক উদ্দীপক হিসেবে বিশেষভাবে কার্যকর। বৃক্ষের ছাল হাঁপানী ও স্বরভঙ্গের সমস্যায় কার্যকর। অনেক কবিরাজের মতে, চোখের যে কোনো ক্ষতে গোলাপ জামের পাতা সিদ্ধ পানি প্রয়োগ উপকারি। কাঠ সাদা বর্ণের, শক্ত, দৃঢ় ও ভারী। ভালো পালিশ নেয় না। তবে গৃহনির্মাণ কাজে খুঁটি ও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফল সুপাদেয় ও গোলাপের গন্ধ পাওয়া যায়।

চালতা

প্রচলিত নাম : চালিতা
ইংরেজি নাম : Chalta,Indian dillenia
বৈজ্ঞানিক নাম : *Dillenia indica speciosa*
পরিবার : Dilleniaceae

আমাদের অতি পরিচিত ফল চালতা। এর সঙ্গে আমরা ছোট বড় সবাই কমবেশি পরিচিত। গ্রামের প্রায় সব বাড়িতেই এ গাছ দেখা যায়। তবে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও সিলেট এলাকায় বেশি জন্মে। প্রাচীনকাল থেকে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চালতা গাছ জন্মাতে দেখা যায়। তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশেষ করে বাংলাদেশ অথবা

ভারতের আসাম রাজ্যের মেঘালয় পর্বতমালার বিস্তৃত অঞ্চলকে চালতার আবাসভূমি বলে মনে করা হয়ে থাকে। সম্ভবত এর আদি জন্মস্থান এসব অঞ্চলেই। আজকাল ভারত, নেপাল বাংলাদেশ, কম্পুচিয়া, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে চালতা গাছ জন্মে থাকে। নিউগিনি, মাদাগাস্কার ও অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন স্থানে চালতা উৎপাদন হতে দেখা যায়। তবে বাগান আকারে কোথাও চালতার গাছ চাষ হয় বলে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি এখনো।

তবে বাংলাদেশের সর্বত্রই এ গাছ জন্মে থাকে। ডালপালাযুক্ত মধ্যম আকারের চিরহরিৎ বৃক্ষ। সাধারণত ১৪-১৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। এর কাণ্ড নাতিদীর্ঘ, কচি ডগা ও পাতা সিলকি লোমশযুক্ত। পাতা দেখতে বেশ বড়, সরল, অবল্যানসিওলেট আকৃতির, লম্বায় ১৫-২৭ সে.মি. এবং চওড়ায় ৭-১২ সে.মি., কিনারা করাতের মতো খাঁজকাটা, ৩০-৪০টি সমান দূরত্বে পার্শ্বীয় সুস্পষ্ট শিরা বিন্যাসের কারণে পাতা দেখতে খুব সুন্দর, একান্তরক্রমে বিন্যস্ত থাকে। চালতার ফুল সাদা, অনুপম সুন্দর, বেশ বড়, দেখতে ম্যাগনোলিয়ার মতো। ফুলে হালকা সৌরভ আছে। পাঁপড়ি ছোট-বড় মিলে ৫টি থাকে। বর্ষাকালে ফুল প্রস্ফুটিত হয়। ফুলের কেন্দ্রে অসংখ্য খাটো খাটো হলুদ পুংকেশর স্ত্রীকেশরকে ঘিরে রাখে এবং স্ত্রীকেশরের গর্ভমুণ্ড অসংখ্য শাখায় বিভক্ত হয়ে আরেকটি ফুলের মতো হয়ে থাকে যা দেখতে দৃষ্টিনন্দন। ফল গোলাকার, তবে খানিকটা চ্যাপ্টা আকৃতির, প্রায় ৭-১০ সে.মি. ব্যাসযুক্ত। কাঁচা ফল দেখতে সবুজ এবং বৃতি বড় হয়ে ফলের সাথে আটকে থাকে। ফল পাকলে হলুদ ভাব ও সুগন্ধি হয়। জুলাই থেকে আগস্ট মাসে বর্ষার প্রারম্ভে, গাছে ফুল আসে এবং সেটেম্বর অক্টোবর মাসে ফল পাকে । ফল আঁঠালো এবং টক। বীজ থেকে চারা হয়। বাংলাদেশের সর্বত্র এটি পাওয়া যায় তবে দক্ষিণাঞ্চলে বেশি দেখা যায়। প্রতিটি পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে ৪০০-৫০০টি ফল পাওয়া যেতে পারে। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে, খনিজ পদার্থ ০.৮ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৫৯ কিলোক্যালোরি, আমিষ ০.৮ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ১৩.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৬ মি:গ্রাম ও ২৬মি. গ্রাম ফসফরাস ও ৫৯ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি বিদ্যমান আছে বলে গবেষকরা মনে করেন। চালতার পাতা, মূল ও ছাল ভেষজ গুণসম্পন্ন। এতে প্রচুর

ভিটামিন সি, ট্যানিন, গ্লুকোজ ও ম্যালিক এসিড রয়েছে। কচি ফল পেটের গ্যাস, কফ, কোষ্ঠকাঠিন্য, বাত ও অরুচি প্রভৃতিতে উপকারি। মূর্ছা রোগে, পেটের বায়ুতে চালতার রস পানিসহ সকাল ও বিকেলে সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। পাকা ফলের রস চিনিসহ পান করলে সর্দিজ্বর নিরাময় হয়। অনেক কবিরাজের মতে, পাকা ও কাঁচা ফলের রস চুলের গোড়ায় লাগালে চুলের গোড়া শক্ত হয় এবং চুল পড়া বন্ধ হয়। চালতা কাঠ লাল, মোটামুটি শক্ত, ভারী, পানি ও মাটিতে টেকসই। ওজন ৭০৫ কেজি। এ কাঠ গানস্টক, যন্ত্রের হাতল, নৌকার তলা ও দরজা-জানালার পাল্লায় ব্যাবহৃত হয়। এছাড়া জ্বালানী ও কাঠকয়লা তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়। বাকল থেকে ট্যানিন তেরি হয়। খাদ্য হিসেবে চালতা আচার, চাটনী প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে। বিভিন্ন প্রকারের রান্না বিশেষ করে চিংড়ি মাছ দিয়ে টক রান্নার জন্য বেশ উপযোগী। অপরিকল্পিত বৃক্ষ নিধনের কবলে পড়ে অতি প্রয়োজনীয় চালতা গাছ আজ বিলুপ্তির পথে। বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশই আজ চালতা গাছ সম্বন্ধে তেমন একটা পরিচিত নয়। বহুবিধ ব্যবহারের গুরুত্ব ও সর্বোপরি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে গাছটির বিলুপ্তি রোধে সবার নজর দেয়া উচিত।

জাম

প্রচলিত নাম : কালো জাম
ইংরেজি নাম : Black berry
বৈজ্ঞানিক নাম : *Syzygium cuminii Linn*. SKeel.
পরিবার : Myrtaceae

ফল হিসেবে আমের পরই বাংলাদেশে অত্যন্ত সুপরিচিত ফল হলো জাম। বাংলদেশের সর্বত্রই এই ফল পাওয়া যায়। তবে কুমিল্লা, নোয়াখালী,

সিলেট, গাজীপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, পাবনা ও টাঙ্গাইল এলাকায় জাম বেশি জন্মে। জাম সাধারণত তাজা ফল হিসেবে খাওয়া হয়। তবে এর রস দিয়ে স্কোয়াস ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত খাদ্য তৈরি করা হয়। পাকা অবস্থায় জামের বর্ণ ঘনকাল থাকে বলে একে কালোজাম বলা হয়। জামের কাঠ অতি মূল্যবান। কচিপাতা পেটের পীড়া আরোগ্য করে। জামের বীজ থেকে প্রাপ্ত পাউডার বহুমূত্র রোগের ওষুধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। জামের জন্মস্থান সম্ভবত ভারত। তবে অনেকের মতে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জই জামের আদি জন্মস্থান। তবে অনেকের মতে পূর্বতন শ্যামদেশ ও বর্তমান থাইল্যাণ্ডও জামের আদি নিবাস হতে পারে। বর্তমানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, দক্ষিণ আমেরিকার ও ইউরোপের দক্ষিণাংশের কিছু কিছু জায়গায়, আফ্রিকা মহাদেশে, অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশে ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্নিয়া ও আলজেরিয়াতে জামের চাষ হয়। ভারত ও বাংলাদেশের সব জায়গায়ই জামগাছ দেখতে পাওয়া যায়, তবে বাগানাকার খুব একটি দেখা যায় না।

রাস্তার ধারে, পুকুর পাড়ে একক গাছ হিসেবে জাম গাছ বেশি দেখা যায়। পাহাড়ি এলাকায় বনের ভেতরে জাম গাছের অস্তিত্ব রয়েছে। জাম সুগঠিত, শক্ত ও বৃহৎ আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ। এতে প্রচুর শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন হয়। উচ্চতায় ১৫-২৫ মিটার পর্যন্ত হয়। এর কাণ্ড সরল, উন্নত, ধূসর বর্ণের ও অমসৃণ। পত্রবিন্যাস বিপ্রতীপ এবং ঘন বিন্যস্ত ও ছায়ানিবিড়। পাতার সবুজ রঙ গাঢ় উজ্জ্বল। শীতের শেষে গাছে প্রচুর পাতা গজায়। পাতা পাতলা ও লম্বাটে ৫-১০ সেমি পর্যন্ত হয়। পাতার উপরিভাগ মসৃণ। বসন্তকালে গাছে ফুল ফোটে। ফুল ছোট, উভলিঙ্গি, সাদা, মৃদুগন্ধী এবং পরপরাগায়িত। মাছি ও মৌমাছির দ্বারা প্রধানত এর পরাগায়ণ হয়ে থাকে। গ্রীষ্মে এই ফল পাকে। পাকা ফলের বর্ণ ঘন কালো, শাঁস বেগুনী আঁশ মিশ্রিত, মৃদু রক্তিম, রসালো। স্বাদে টক মিষ্টি ও অত্যন্ত পুষ্টিকর। সৌন্দর্য ও গুণের আঁধার জামকে ইংরেজিতে ব্ল্যাকবেরি বলে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত জামকে কোনো নির্দিষ্ট নামে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে কালোজাম ও ক্ষুদে জাম এ দু'ধরনের জাতই আমাদের দেশে পাওয়া যায়। সাধারণত বীজের মাধ্যমেই জামের

বংশ বিস্তার করা হয়। তবে জোড়কলম, গুটিকলম, ভিনিয়ার গ্রাফটিং ও কুঁড়ি সংযোজন ও তালি চোখ কলম করে জামের বংশ বিস্তার করা যায়। ফলের বর্ণ দেখেই পাকা ফল চেনা যায়। পাকা ফল বেগুণী বা কালোবর্ণ ধারণ করে। ফল হাতে সংগ্রহ করাই ভালো তবে গাছের নিচে জাল ধরে শাখায় ঝাকুনী দিয়েও ফল সংগ্রহ করা যায়। সমস্ত ফল এক সাথে পাকে না বলেই ২/১ দিন পরপর ফল সংগ্রহ করতে হয়। এক মাসেই সমস্ত ফল পেকে যায়। শেষ সময়ের ফলের মান বেশ নিম্ন মানের হয়। সংগ্রহের সাথে সাথেই ফল বাজারজাত করা ভালো। কারণ জাম ৪/৫ দিনের বেশি ভালো থাকে না। জামের গাছ প্রতি প্রায় ৮০-৯০ কেজি ফল হয়। কালোজামের শাঁসের পুষ্টি গুণ প্রতি ১০০ গ্রামে ২৮.২ ভাগ পানি, ১৯.৭ ভাগ শ্বেতসার, ০.৭ ভাগ আমিষ, ০.২ ভাগ স্নেহ, ০.৪ ভাগ খনিজ লবণ, ০.৯ ভাগ আঁশ, ০.০২ ভাগ লৌহ এবং ৮৩ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে। এ ছাড়াও আছে ০.০১ মিগ্রা. থায়ামিন, ০.২৮ মিগ্রা. রাইবোফ্লাভিন, ০.২ মিগ্রা., নায়াসিন ও ৫০ মিগ্রা. ভিটামিন সি। খাদ্যমানের দিক দিয়ে কালোজাম একটি উৎকৃষ্ট ফল। জাম বেশ পুষ্টিকর ফল। ফল টক, আয়রন সমৃদ্ধ ও উপাদেয়।

জামের কচিপাতা পেটের পীড়া নিরাময়ে সাহায্য করে। জামের পাতা, ছাল, ফল, বীজ সবই ভেষজগুণ সম্পন্ন। এটি আমাশয়, ডায়াবেটিস,. কণ্ঠস্বরের জড়তা, কফ-কাশি ও যকৃৎজনিত রোগে উপকারি। জাম ও আমের রস একত্রে পান করলে ডায়াবেটিস রোগীর তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। জামের বীজ গুঁড়ো করে নিয়মিত সেবন করলে ডায়াবেটিস উপশম হয়। হাত-পা কেটে গেলে জাম পাতার রস সেখানে লাগালে তৎক্ষণাৎ রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যায়। পাতা ও ছাল সিদ্ধ পানিতে কুলকুচা করলে দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তপড়া বন্ধ হয়। কাঠ মোটামুটি শক্ত, দৃঢ় ও টেকসই। কাঠ গৃহনির্মাণে দরজা-জানালা , চৌকাঠ, খুঁটি, কড়ি, বরগা, বীম, তাক, ছোট গাড়ির চাকা, ঢেঁকি, জোয়াল, দাড়, ভোঙ্গা, মাস্তুল, কৃষি উপকরণ, হাতল, কাইল, ক্ষুদাই, বিভিন্ন আসবাবপত্র ও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাকল থেকে ট্যানিন পাওয়া যায় এবং তা রঙে ব্যবহৃত হয়। পাতা তসর গুটিপোকার উত্তম খাদ্য।

জামরুল

প্রচলিত নাম : জামরুল, সাদা জাম
ইংরেজি নাম : Wax jambu/ Jamrul
বৈজ্ঞানিক নাম : *Syzygium samarangense*.(BL).Merr
পরিবার : Myrtaceae

জামরুল গাছ ও ফল দুটিই দেখতে খুব সুশ্রী। পাকা বড় ফল আভিজাত্যের প্রতীক। বাংলাদেশে খুব অল্প সংখ্যক জামরুল গাছ রয়েছে। থোঁকা থোঁকা সাদা জামরুলের পূর্ণ গাছ বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক। এটি রসালো ও হালকা মিষ্টি ফল। তাই গ্রীষ্মকালে এর কদর বেশি। দেশের সর্বত্রই বসতবাড়ির আশেপাশে বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটা গাছ দেখা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় জামরুল গাছ প্রচুর পরিমাণে দেখা গেলেও জামরুল কিন্তু বাংলাদেশের স্থানীয় গাছ নয়। জামরুলের আদিবাস আন্দামান, নিকোবর ও মালাক্কা। বর্তমানে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, বার্মা, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে এ গাছের চাষ হতে দেখা যায়। এটি উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া পছন্দ করে। এই সুশ্রী ফলের সাথে আমরা ছোট বড় সবাই পরিচিত। এটি খেতেও অত্যন্ত সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। প্রচুর ডালপালাযুক্ত, মধ্যম আকারের বৃক্ষ। পাতা গাঢ় সবুজ, প্রায় ১০-১৫ সে.মি. লম্বা; উপবৃত্তাকার, লম্বা, মসৃণ। ফুল হলুদাভাব সাদাটে; বৃত্যাংশ ৪টি, পাঁপড়ি থাকে। অসংখ্য পুংকেশর গোলাকারভাবে ছড়িয়ে থাকে, দেখতে মনোরম। প্রান্তিয় বা পত্রাক্ষে সাইম প্রকারের পুষ্পমঞ্জরীতে ফুল বিকশিত হয়, দেখতে খুবই সুন্দর।

মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয়। বীজ, গুটি কলম ও কাটিং করে চারা উৎপাদন করা যায়। এ গাছটি ফল গাছ হিসেবে লাগানো হয়। দেশের প্রায় সর্বত্রই

এটি দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত সবুজ ধরনের হলেও জামরুল ফল লালচে ও গোলাপী রঙেরও হয়ে থাকে। জামরুল গাছে ফুল আসে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে এবং ফল পাকে জুন-জুলাই মাসে। গাছের শাখায় গোছায় গোছায় ফল উৎপন্ন হয়। পাকা ফল হাতে সংগ্রহ করাই ভালো। ঝাঁকি দিয়ে ফল মাটিতে ফেললে বেশি সময় সংরক্ষণ করা যায় না। একটি ফলবান গাছ থেকে বছরে ৫০০-৭০০টি ফল সংগ্রহ করা যায়। জামরুলের পুষ্টি উপাদান আহার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম ফলে ৮৯.১ গ্রাম পানি, ১.০ গ্রাম আশ, ৩৯ খাদ্যক্যালরি, ৮.৫ গ্রাম শর্করা, ০.৭ গ্রাম আমিষ, ০.২ গ্রাম চর্বি, ০.৩ গ্রাম খনিজ লবণ, ৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ভিটামিন বি-১ ০.০১মি.গ্রা.,ভিটামিন-২ ০.০৫মি.গ্রা., ১০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, .৫ মিলিগ্রাম লৌহ, ১৪১ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন ও ৪০ কিলোক্যালোরি খাদ্যশক্তি থাকে। এটি একটি ভিটামিন বি-২ সমৃদ্ধ ফল। অন্যান্য পুষ্টি উপাদানও রয়েছে। এ গাছের বাকল, পাতা ফল ভেষজগুণ সম্পন্ন। জামরুল ফল সি-ভিটামিনযুক্ত। এটি বলকারক, ত্বকের লাবণ্যতা বৃদ্ধি করে এবং ক্ষুধা বাড়ায়। এই ফল বহুমূত্র রোগীর তৃষ্ণা নিবারণে উপকারী। পাকা ও পরিপক্ক জামরুল খেতে সুস্বাদু। পুষ্টিমূল্যেও এটি সমৃদ্ধ ও আহার উপযোগী। জামরুল কাঠ শক্ত হলেও আসবাবে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু জ্বালানী ছাড়াও গৃহস্থালির কাজ চলে।

জাম্বুরা

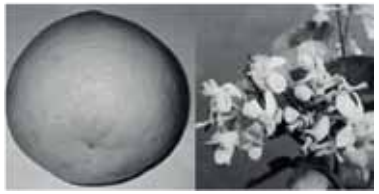

প্রচলিত নাম : জাম্বুরা, বাতাবী লেবু, মহালেবু
ইংরেজি নাম : Shaddock, Pummelo, Forbidden Fruit
বৈজ্ঞানিক নাম : *Citrus grandis* (Linn.) Osbeck
পরিবার : Rutaceae

বাতাবি লেবু বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় ফল। অনেকে একে জাম্বুরা বলে। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফলের মধ্যে জাম্বুরা অন্যতম। ডালপালাযুক্ত ছোট আকারের বৃক্ষ। একে অনেকে বিলাতি লেবুও বলে। মৌলভীবাজার, সিলেট, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, চট্টগ্রাম, রংপুর, পাবনা, রাজশাহী ও পিরোজপুর জেলায় সর্বাধিক পরিমাণে বাতাবি লেবু উৎপন্ন হয়। এ দেশে সাড়ে ৪ হাজার হেক্টর জমিতে প্রায় ১৫ হাজার টন বাতাবি লেবু উৎপন্ন হয়। জাম্বুরার আদিবাস সম্ভবত থাইল্যাণ্ড কিংবা মালয়েশিয়ায়। সেখান থেকে চীন, ভারত ও ইরানে বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে প্রায় বাড়িতে জাম্বুরার গাছ দেখতে পাওয়া যায়। জাম্বুরা মাঝারি আকারের গাছ, বাকল ধূসর সবুজাভ বর্ণের। শাখায় কাঁটা আছে। পাতা গাঢ় সবুজ ও উপবৃত্তাকার কিংবা ডিম্বাকৃতি, ৮-১৫ সে.মি. লম্বা ও ৬-১০ সে.মি. চওড়া হয়। বোঁটায় পাখনা আছে। ফুল ধবধবে সাদা বর্ণের, ৫ পাঁপড়ি বিশিষ্ট। ফুলের কেন্দ্রে স্ত্রী কেশরকে ঘিরে অসংখ্য পুংকেশর থাকে। জাম্বুরা গ্রীষ্মে ফুল হয়। বর্ষাকালে ফল ধরে। ফল মোটামুটি গোলাকার। বীজ বা চোখ কলমের মাধ্যমে বংশবিস্তার ঘটে। ফল কিছুটা হলদে রঙ ধারণ করলে ভাদ্রের প্রথম থেকে মধ্য আশ্বিন পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়। জাম্বুরায় পুষ্টিগুণ প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী জাম্বুরায় পুষ্টি রয়েছে পানির ভাগ ৯০.৩ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৩ গ্রাম, প্রোটিন ০.৫ গ্রাম, শর্করা ৮.৫ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৭ মি:গ্রাম:, আয়রন ০.২ মি:গ্রাম:, ক্যারোটিন অথবা ভিটামিন 'এ' ১২০ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বি-১, ০.০৬ কিলো ক্যালোরি ও ফসফরাস ৩০ মিলিগ্রাম। তবে এই পুষ্টিমাণ জাম্বুরার জাত ও উৎপাদনের স্থানের উপর নির্ভরশীল।

জাম্বুরা একটি ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ পুষ্টিকর ফল। এতে প্রচুর ভেষজ গুণ রয়েছে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, মুখের রুচি বৃদ্ধি করে ও পুরাতন আমাশয় ফলের রস খুবই কার্যকরী। এটি প্রচুর ভেষজ গুণ সম্পন্ন ও প্রচুর ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল। পাতা, ফুল ও ফলের খোসা পানিতে সেদ্ধ করে পান করলে মৃগী, হাত-পা কাঁপা ও প্রচণ্ড কাশি রোগীর প্রশান্তি আনে। একজন মানুষের

জন্য দৈনিক ৫০ গ্রাম জাম্বুরা খেলেই প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় ভিটামিন 'সি'-এর অভাব পূরণ হয়। তাছাড়া এতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণও অনেক বেশি। মশার কামড়ে এটি বিশেষ উপকারি। টক ফল হিসেবে খাওয়া হয়। কাঠ হালকা ও শক্ত, পালিশযোগ্য নয়। তাই জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ডালিম

প্রচলিত নাম : ডালিম
ইংরেজি নাম : Pomegranate
বৈজ্ঞানিক নাম : *Punica granatum* Linn.
পরিবার : Punicaceae

ডালিম ছোট আকারের গাছ। এটা খুব সুস্বাদু ফল, তবে ফলের তুলনায় ভক্ষণযোগ্য অংশ খুব অল্প। বাংলাদেশের সর্বত্রই বসতবাড়ির অঙিনায় দু'একটা ডালিম গাছ দেখা যায়। তবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং রংপুর এলাকায় বেশি উৎপন্ন হয়। ডালিম উষ্ণমণ্ডলের একটি অতি প্রিয় ফল। বাগান আকারে এর চাষের প্রমাণ না থাকলেও প্রায় প্রতি বাড়িতেই এ গাছ দেখা যায়। সৌন্দযবর্ধনের জন্যও অনেকেই ডালিম গাছ লাগিয়ে থাকে। হিমালয়ের পাদদেশে ডালিমের অনেক বন্য-প্রজাতি দেখা গেলেও বৈজ্ঞানিকগণ ইরানকেই এর উৎপত্তিস্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ ইউরোপের ক্রান্তিয় অঞ্চলসহ ইরান, মিশর, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, মরক্কো, আলজেরিয়া, স্পেন প্রভৃতি স্থানে ডালিমের চাষ হতে দেখা যায়।

ডালপালাযুক্ত, মাঝারির চেয়ে ছোট আকৃতির বৃক্ষ। এ গাছ ছোট লিকলিকে, উচ্চতা ৩-৫ মিটার। পাতা চিকন ও দীর্ঘ। ফুল লাল বর্ণের। ফুলের বৃতি ফানেলের মতো, বৃত্যাংশ ৭টি, শক্ত ও পুরু হয়, পাঁপড়ি ৭টি, উজ্জ্বল লাল বর্ণের, কাগজের মতো পাতলা, ফুলের কেন্দ্রে অসংখ্য হালকা হলুদ পুংকেশর স্ত্রীকেশর কে ঘিরে রাখে। কোনো কোনো গাছে শুধু পুংপুষ্প দেখা যায়। আবার কোনো কোনো গাছে পুং ও স্ত্রী উভয় প্রকার ফুল দেখা যায়। ফল বেরী প্রকৃতির ও প্রায় গোলাকার। ডালিম গাছ পাতা চির হরিৎ হতে দেখা যায়। বীজ থেকেই সাধারণত চারা তৈরি করা হয়। শাখা বা গুটিকলমের দ্বারা এর অঙ্গজ বংশ বিস্তার করা যায়। চার বছর থেকেই ডালিম গাছে অল্প অল্প ফল ধরতে থাকে এবং ৮/১০ বছর বয়সী গাছে প্রচুর ফল ধরে। তবে কলমের গাছে দু'বছর পর থেকেই ফল আসে এবং এই ফলন ৩০ বছর পর্যন্ত বজায় থাকে। ফুল আসার সময় থেকে মাস ছয়েক পর ফলগুলো পাড়ার উপযুক্ত হয়। ফলের খোসার বর্ণ হলদেটে বা বাদামি হলেই ফল সংগ্রহ করতে হয়। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে বছরে ৮০-১০০টি ফল পাওয়া যেতে পারে। ডালিমের ফলের তুলনায় এর ভক্ষণযোগ্য অংশ খুবই কম। ভক্ষণযোগ্য অংশের প্রতি ১০০ গ্রামে ৭৮ ভাগ পানি, ১.৫ ভাগ আমিষ, ০.১ ভাগ স্নেহ, ৫.১ ভাগ আঁশ, ১৪.৫ ভাগ শ্বেতসার, ০.৭ ভাগ খনিজ পদার্থ, ১০ মিগ্রা ক্যালসিয়াম, ১২ মিগ্রা ম্যাগনেসিয়াম, ১৪ মিগ্রা অক্সালিক এসিড, ৭০ মিগ্রা ফসফরাস, ০.৩ মিগ্রা রাইবোফ্লোভিন, ০.৩ মিগ্রা নায়াসিন ও ১৪ মিগ্রা ভিটামিন সি থাকে।

ফল, ফলের খোসা, মূলের ছাল, ফুল, পাতা ইত্যাদি সবই ব্যবহৃত হয়। ডালিম তৃপ্তিকারক, অরুচিনাশক, বলকারক, পিত্তবর্ধক, রক্তস্রাব, আমাশয় ও মেধাবৃদ্ধিকারক। ডালিমের খোসা ছাগলের দুধের সাথে খেলে রক্ত আমাশয় সেরে যায়। ডালিমের রস কুষ্ঠ রোগের উপকারে আসে। যাদের শরীরে অতিরিক্ত মেদ জমে যাচ্ছে তারা ডালিমের রসের সাথে ২/১ চা চামচ মধু মিশিয়ে প্রতিদিন একবার করে খেলে শরীরের বাড়তি মেদটা ঝরে যাবে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে। আরো অনেক ডালিমের ভেষজ গুণ রয়েছে যা

বলে শেষ করা যাবে না। আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রেও এর ব্যবহার সর্বজনস্বীকৃত। কাঠ মোটামুটি শক্ত এবং ছোট আকারের জিনিস ও হাতল নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

তাল

প্রচলিত নাম : তাল
ইংরেজি নাম : Palmyra palm
বৈজ্ঞানিক নাম : *Borassus flabellifer Linn.*
পরিবার : Palmaeceae

তাল বাংলাদেশের অতি পরিচিত একটি গাছ। তবে তাল আমাদের দেশের বৃহত্তম পাম গাছ। বাংলাদেশে পাম জাতীয় ফলের মধ্যে তাল গাছ সবচেয়ে উঁচু। এই গাছ প্রাকৃতিকভাবে কোনো রকম যত্ন ছাড়াই বসত বাড়ির আশে-পাশে, পুকুর, নদী ও বাঁধের ধারে অথবা জমির আইলে জন্মায়। তাল একটি গুচ্ছমূলি শতায়ু উদ্ভিদ। তাল গাছকে পাখাপাদ্রী পাম বলা হয়। বাংলাদেশের সর্বত্রই তাল গাছ জন্মে থাকে। তবে ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, রাজশাহী, খুলনা এলাকায় তাল গাছ বেশি জন্মে থাকে। তালের উৎপত্তিস্থান হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। এর আদিবাস দক্ষিণ এশিয়ায়। তালের জন্মভূমি মধ্যআফ্রিকা। উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে এ গাছ জন্মালেও শ্রীলঙ্কা, ভারত ও বাংলাদেশের সর্বত্রই কম-বেশি জন্মে। তবু এ দেশে বড় পরিচিতি আছে তার। রোপণের ১২-১৫ বছর পরে তাল গাছে পুষ্পমঞ্জরী বের হয়। এর আগে স্ত্রী ও পুরুষ গাছ চেনার কোনো উপায় থাকে না। ডিসেম্বর-মার্চ মাসে ও জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকে।

গাছ ২৫-৩০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়, সোজা এবং কাণ্ডের ব্যাস ১ মিটার পর্যন্ত হতে দেখা যায়। তাল গাছ প্রায় ১০০-১৫০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। বাকল কালো, পাতা পাখার মতো ১-২ মিটার ব্যাসার্ধের হয় এবং ৬০-৮০ খণ্ডে বিভক্ত, মধ্যশিরা বরাবর ভাঁজ থাকে। পাতার ডগা লম্বা এবং উভয় পাশে করাতের মতো কালো দাঁত আছে। পুরুষ স্পেডিক্স শাখাযুক্ত এবং ২০-৪০ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। স্ত্রী স্পেডিক্সে বড় আকারের ফুল হয়। ফল ড্রোপ ও ১৫-২০ সে.মি. পর্যন্ত ব্যাসার্ধের হয়। প্রস্ফুটনের কাল ব্যতীত স্ত্রী ও পুরুষ নির্ণয় করা কঠিন। পুংপুষ্পের দীর্ঘ, গোলাকৃতি শাখায়িত মঞ্জরী 'তালের জটা' নামে পরিচিত। এ জটা থেকে রস সংগ্রহ করা যায়। ফল গোলাকার ওজনে ১/২ কেজি হয় এবং প্রতিটি গাছে ১০০-২০০টি ফল ধরে। প্রতি ফলে ৩টি করে বীজ থাকে। বীজের সাহায্যে এর বংশ বিস্তার করা হয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে (ভাদ্র-আশ্বিন) তাল পাকে। পাকা ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। একটি তাল থেকে ২-৩টি বীজ পাওয়া যায়। একটি ভালো পরিপুষ্ট বীজ ১২-১৫ সে.মি. লম্বা, ১০-১২ সে.মি. চওড়া ও ৬-৭ সে.মি. উচ্চতা সম্পন্ন হয়। বীজের আবরণ খুব পুরু ৪-৯ মি.মি. পর্যন্ত হতে পারে। ডিসেম্বর-মার্চ মাসে গাছে ফুল আসে ও জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকে। ফল গোলাকার, ওজনে ১-২ কেজি হয় এবং প্রতিটি গাছে ১০০-২০০টি ফল ধরে। প্রতি গাছ থেকে বছরে ৫০০-৬০০ লিটার রস সংগ্রহ করা সম্ভব। সাধারণত শীতকালে রস সংগ্রহ করা হয়। রস সংগ্রহকারিকে গাছি বলা হয়। গাছি তাল গাছের ফল বেরুনোর আগে পুষ্পমঞ্জরী থেকে রস নিংড়ে নেয়। এ রস আহরণ প্রক্রিয়া খুব জটিল। তাই দক্ষ গাছির প্রয়োজন। ৩০-৪০ বছর বয়সের গাছে রস বেশি হয়।

পাকা তালে খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে পুষ্টির পরিমাণ ৭৭.২ গ্রাম পানি, ০.৭ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ০.৫ গ্রাম আঁশ, ৮৭ খাদ্যশক্তি কিলোক্যালোরি, ০.৭ গ্রাম আমিষ, ০.২ গ্রাম চর্বি, ২০.৭ গ্রাম শর্করা, ৯ মি:গ্রাম ক্যালসিয়াম খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে পুষ্টির পরিমাণ কচি তালে ৯২.৩ গ্রাম পানি, ০.২ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ০.৩ গ্রাম আঁশ, ২৯ খাদ্যশক্তি কিলোক্যালোরি, ০.৬ গ্রাম আমিষ, ০.১ গ্রাম চর্বি, ৬.৫ গ্রাম

শর্করা, ৪৩ মি:গ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.৫ লৌহ, ০.০১ মি:গ্রাম ভিটামিন বি-২ ও ৪ মি:গ্রাম ভিটামিন সি থাকে। তালরস শীতল, গলা ও বুক জ্বলানাশক, বলকারক, শ্লেষ্মানাশক, মুত্রকর, প্রদাহ, শোথ ও উত্তেজনা নিবারক। তালের শাঁস পুষ্টিকর, চর্মরোগ ও ঘামনাশক। তালের রস দিয়ে নানা রকম উপাদেয় খাবার তৈরি করা যায়। তালপাতা থেকে তৈরি হয় টুপি, ঝুড়ি, পাখা, চাটাই, মাদুর, ছাতা ইত্যাদি। কাঠ থেকে তৈরি হয় ঘরের কড়ি-বরগা, খেলনা, ছাতির বাট, লাঠি, বাক্স এবং আঁশ থেকে তৈরি হয় ব্রাশ ও পাপোশ। যার প্রচলন দেশে-বিদেশে বিখ্যাত। তালের 'কয়ের' রপ্তানীযোগ্য পণ্য। পুরুষ গাছের চেয়ে স্ত্রী গাছের কাঠ দীর্ঘস্থায়ী ও উৎকৃষ্টতর। রেওয়াজ আছে একশো বছরেও নাকি এ কাঠ ক্ষয় হয় না। এর কাঠ দিয়ে ভেলা, ঘরের খুঁটি তৈরি হয়। তালের রস দিয়ে নানা রকম উপাদেয় খাবার তৈরি করা যায়।

নারকেল

প্রচলিত নাম : নারকেল
ইংরেজি নাম : Coconut
বৈজ্ঞানিক নাম : *Cocos nucifera Linn.*
পরিবার : Palmae

বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত গাছ নারকেল। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহই নারকেল চাষের উপযুক্ত স্থান। এই গাছ পামগোত্রীয়। এ গাছের বহুবিধ ব্যবহারের জন্য একে স্বর্গীয় গাছ বলা হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যান্য ফলের মধ্যে নারকেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের

প্রতিটি জেলাতেই কম-বেশি নারকেলের চাষ হয়। তবে বরিশাল, খুলনা, পটুয়খালী, ভোলা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, যশোর ও নোয়াখালী জেলায় সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মাটি লবণাক্তহীন বলে স্বল্প পরিমাণে এই গাছ জন্মায়। খাদ্য-পানীয় থেকে শুরু করে গৃহনির্মাণের সরঞ্জাম ও পশুখাদ্য নারকেল গাছ থেকে পাওয়া যায়। বসতবাড়ি, পুকুরপাড়, রাস্তা, স্কুল-কলেজ, মাঠ-ঘাট প্রভৃতির আশেপাশে এ গাছ লাগিয়ে বাড়তি আয়ের সংস্থান করা যায়। আমাদের দেশে ৩১ হাজার হেক্টর জমিতে এর চাষ হয়ে প্রায় ৮৯ হাজার মে. টন নারকেল উৎপাদন হয়।
প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপ এলাকা নারকেলের জন্মভূমি। এই গাছ শ্রীলংকা, ভারত, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, চীন, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং বাংলাদেশের সর্বত্র কম-বেশি জন্মে। লম্বা ধরনের নিপাট কাণ্ডের গাছ নারকেল। গাছের মাথায় একগুচ্ছ লম্বা লম্বা সারি সারি পাতা রয়েছে। প্রতিটি পাতায় আবার সমান্তরালভাবে অনেকগুলো লম্বাটে ধরনের পত্রফলক রয়েছে। এই গাছের শীর্ষ অংশে একসাথে অনেকগুলো সবুজ রঙের ফল হয়। বীজ গোলাকৃতি কিংবা বলা যায় ডিম্বাকৃতি, এক প্রান্ত সরু কৌণিক এবং অন্য প্রান্ত গোল ও তিনটি দাগে চিহ্নিত।

দাগ তিনটির একটির সঙ্গে নরিকেল ভ্রূণ যুক্ত থাকে। শরতে ফুল ফোটার সময়। তবে প্রায় সারা বছরেই ফল ধরে। ফল পাকতে প্রায় এক বছর সময় লাগে। এই গাছের ফুল বেশ মনোহর, সাদাটে বর্ণের। অনেকগুলো ফুল জড়ো অবস্থায় একসাথে জন্মায়। নারকেল ফল সবুজ রঙের। তবে পরিপক্ব হওয়ার সাথে সাথে ফলের রঙ পরিবর্তিত হতে থাকে। তখন ফলের রঙ অনেকটা বাদামী ধরনের হয়। পাকা নারিকেলের শাঁস দুধ-সাদা, কঠিন, সুগন্ধি ও সুস্বাদু এবং জল সুমিষ্ট, খাদ্য সম্পদে সমৃদ্ধ। অপরিহার্য এই পানীয় শোষণেই নারিকেলের ভ্রূণ চারা হয়ে উঠে। ভ্রূণের শিকড় ও ভ্রূণকাণ্ড নারিকেলের মালার খোল ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং সবুজ পাতা ক্রমে আলোয় উন্মোচিত হয় । নারকেলের ফল ড্রোপ। প্রতি মাসে অথবা ৪০ দিন অন্তর ফুল আসে। গাছপ্রতি বছরে ৫০-১৫০ টি ফল পাওয়া যায়।

জাত ও পরিচর্যার উপর ফলন নির্ভর করে। খাদ্যোপযোগী ডাবের পানিতে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান রয়েছে। আমাদের দেশে নারকেলের ওজন ভিত্তিতে শতকরা ৩৪.৪৪ ভাগ ছোবরা, ১৬.৭ ভাগ খোল, ৩০.৭৩ ভাগ শাঁস ও ১৯.১৩ ভাগ পানি থাকে। এগুলোর মধ্যে পানি ও শাঁস খাওয়া হয়। ৪ মাস বয়স পর্যন্ত ডাবে কোনো শাঁস হয় না। প্রকৃত পক্ষে ডাবের পানিও এক ধরনের শাঁস। কচি ডাবের পানিতে চিনির পরিমাণ কম থাকে। ধীরে ধীরে শাঁস গঠন শুরু হলে পানিতে চিনির পরিমাণ বাড়তে থাকে। ৭/৮ মাস বয়সের সময় পানিতে সর্বাধিক চিনি থাকে। তখন তা মিষ্টি লাগে। ডাবের পানিতে শতকরা ৯৫.৫ ভাগ জলীয় উপাদান, ০.১ ভাগ আমিষ, ০.১ ভাগ স্নেহ, ৪ ভাগ শর্করা, ০.৪ ভাগ খনিজদ্রব্য, ০.০১ ভাগ ফসফরাস, ০.০২ ভাগ ক্যালসিয়াম ও ০.৫ মি.গ্রা. লৌহ থাকে। পরিপক্ক নারকেলের টাটকা শাঁসে সাধারণত শতকরা ৪৫ ভাগ জলীয়দ্রব্য, ৪ ভাগ আমিষ, ৩৭ ভাগ স্নেহ, ১০ ভাগ শর্করা ও ৪ ভাগ খনিজ দ্রব্য থাকে। নারকেলের প্রচুর ভেষজগুণ রয়েছে।

বিভিন্ন রকম পেটের গোলযোগে গ্লুকোজ স্যালাইনের বিকল্প হিসেবে ডাবের পানি খুবই উপকারী। ঘন ঘন পাতলা পায়খানা ও বমির ফলে দেহে যে পানির অভাব ঘটে তা পূরণে ডাবের পানি অত্যন্ত কার্যকরী। এটি পিত্তনাশক ও কৃমিনাশক।। কোষ্ঠবদ্ধতায় ঝুনো নারকেলের পানি প্রত্যেহ খালি পেটে এক বা দু'কাপ করে খেলে নিরাময় লাভ করা যায়। ফলের মালা বা আইচা পুড়িয়ে পাথরবাটি চাপা দিয়ে পাথরের গায়ে যে গাম বা কাই হয় তা দাদের জন্য মহৌষধ। এছাড়া অনেকের প্রস্রাব লাগলে ধরে রাখার ক্ষমতা থাকে না । এক্ষেত্রে নারকেল গাছের কাঁচা শিকড় ছেঁচে রস করে সকালের দিকে এক চা চামচ ও বিকেলের দিকে এক চা চামচ একটু দুধ মিশিয়ে খেলে ৭-৮ দিনের মধ্যেই উপকার পাওয়া যাবে। সুখাদ্য হিসেবে নারকেলের শাঁস পিঠা, সন্দেশ, কেক, পেস্ট্রি, চকোলেট, লজেন্স এবং দৈনন্দিন রান্নায় ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। অতিথি আপ্যায়নে নারকেল এক সময় ব্যাপক প্রচলিত ছিলো। তবে সর্বত্রই ডাবের জলের আদর এখনো আছে। নারকেল কচি অবস্থায় ডাব হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কচি ডাবের খোসা ছাগলের ভালো

খাদ্য। পাকা নারকেলে শাঁসে ৩০-৪০% তেল পাওয়া যায় এবং নারকেল তেল মাথায় এবং খাদ্য হিসেবে তরকারিতে ব্যবহৃত হয়। শুকনো নারকেলের ছোবড়া হতে দড়ি, কুশন, জাজিম ও পাপোষ ইত্যাদি তৈরি হয়। নারকেলের পাতা ঘরের ছাউনীতে, মাদুর, ঝুড়ি তৈরিতে এবং পাতার মধ্য শিরা দিয়ে ঝাড়ু তৈরি হয়। গাছের ফুলের ডাটা হতে সুমিষ্ট রস সংগ্রহ হয়। নারকেলের খোল থেকে জ্বালানী ও কাঠ কয়লা তৈরি হয়। কাণ্ড সরল সোজা বিধায় বৈদ্যুতিক খুঁটি, বেড়ার খুঁটি, হাঁটার ছড়ি, টার্নেরি, বর্শার হাতল, কারুকাজে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের মালা কুটির শিল্পের কাজে ও হুক্কাতে ব্যবহৃত হয়। মালা পোড়ানো ছাই কালো ব্লাকবোর্ড আস্তরণে ব্যবহৃত হয়। নারকেলের শাঁস থেকে তৈরি তেল কেশ সমৃদ্ধ এবং দামি সাবান, শ্যাম্পু ও অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রীর উপাদান। দক্ষিণ ভারতে নারকেলের তেল রান্নায় ব্যবহৃত হয়।

সোফিয়া হোসেন
২/১০ স্যার সৈয়দ রোডফ
ফ্লাট-৩/সি, মুহাম্মাদপুর
ঢাকা-১২০৭।

বর্ণ ভেদে আলোর গতি আপেক্ষিক

মাহিরুর রহমান

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বটা যদি আমরা সহজে বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে একটি খোঁঠায় বাঁধা মেষের দিকে তাকাই। মেষটি সারাদিন সেখানে শায়িত বা নিদ্রিত অবস্থায় তার দৈনন্দিন জীবন কাটায় কিন্তু সে কিছুই মনে করে না। আর মানুষকে যদি মেষের খোঁঠায় বেধেঁ রাখা হয় তাহলে সে সামান্য সময় থাকতে চায়। এটাই একটার সাথে আর একটার তুলনা বা আপেক্ষিকতা। আপেক্ষিকতা আবার কয়েক প্রকার হতে পারে যথা-প্রাণীর সাথে প্রাণীর তুলনা, জড় এর সাথে জীবের তুলনা ইত্যাদি। এরই উপর ভিত্তি করে আইনষ্টাইন আলোক, বিশ্বজগত, কাল, মাত্রাকে একের সাথে অন্যের তুলনা করে আপেক্ষিক বলেছেন। আসুন, আমরা এবার আমাদের থিসিসের আদিতে যাই। আইনষ্টাইন বলেছেন- পৃথিবীতে একটি মাত্র গতি আছে যা আপেক্ষিক নয়। আর তা হলো আলোকের গতি, আলোর গতি ধ্রুবক। অর্থ্যাৎ আলোর গতির উপরে কোনো গতি নেই। ধরুন, আমরা তার বিপরীত মনে করি যে, আলোর গতি আপেক্ষিক। কিভাবে? বর্ণভেদে অর্থ্যাৎ বর্ণভেদে আলোর গতি আপেক্ষিক। শুধু গতি পরিবর্তন হয় না, কিন্তু শক্তির তারতম্য ও ঘটে। তাহলে আমরা প্রমানে আসি।

দেখুন (Solar Light) সূর্যের সাদা আলোর ভিতর সাতটি রঙ্গের আলো আছে যথাঃ বেগুনি, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল। কেন, এই সূর্যের সাদা রঙ থেকে ভিন্ন রঙের সৃষ্টি হয়? তার কারণ হল শক্তির তারতম্যে বা শক্তি ক্ষয়ের কারণে। আসুন, সত্যি করে বুঝি। সূর্যের সাদা আলোকে

প্রিজমের মাধ্যমে প্রতিফলিত করলে সাতটি রঙের আলো বের হয়। আর রঙের ভিন্নতায় আলোগুলো এক এক ভাবে বেঁকে যায়। যেমন-বেগুনি রঙের আলো যতটুকু বাঁকে তার তুলনা হয় সাতটি রঙের সাথে এভাবে যে- বেগুনি রঙের আলো সবচেয়ে বেশি বাঁকে। বেশি বাঁকার কারণ হলো বেগুনি রঙের আলো অন্যান্য রঙের তুলনায় কম শক্তি ও গতি সম্পন্ন। শক্তির কারণে বেগুনি রঙের আলো কম বাঁকে। আর কম বাঁকার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে বেগুনি রঙের গতি অন্যান্য গতি অর্থ্যাৎ অন্য রঙের আলোর গতির চেয়ে কম গতি সম্পন্ন। ঠিক তেমনি নীল রঙের আলো আসমানীর চেয়ে; আসমানী আলো, সবুজের চেয়ে; সবুজ আলো হলুদ রঙের আলোর চেয়ে; হলুদ আলো কমলা আলোর চেয়ে; কমলা আলো লাল আলোর চেয়ে বেশি বাঁকে। শক্তির তারতম্যে এবং গতির আপেক্ষিকতায় আর্থ্যাৎ রঙের ভিন্নতার কারণে শক্তির ক্ষয় বা শক্তির তারতম্য হয়। আর লাল আলোর গতি ধ্রুবক। অর্থ্যাৎ লাল আলোর গতির উপরে কোনো গতি নেই। অন্য দিকে বেগুনি রঙের আলোর গতির নিচে কোনো গতি নেই। পরিশেষে, আমরা বলতে পারি যে, বর্ণভেদে আলোর গতি আপেক্ষিক। আর গতি বৃদ্ধির তারতম্যে লাল আলোর গতি ধ্রুবক এবং গতি হ্রাসের ভিত্তিতে বেগুনি রঙের আলো ধ্রুবক।

মাহিরুর রহমান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন জলবায়ু পরিবর্তন কৃষি সংকটাপন্ন ও খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত

জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবুর

সাম্প্রতিককালে বড় দুটো সমস্যা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতার অত্যধিক বৃদ্ধি এবং তার নেতিবাচক প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে জলবায়ুর পরিবর্তন ও সারা বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন সংকটাপন্ন খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন। এ সমস্যাগুলো সম্পর্কে অনেকেই চিন্তিত, আতংকিত ও শংকিত; কেননা সমস্যাগুলোর কার্যকরী প্রভাব আরো বেশি ভয়াবহরূপ ধারণ করলে শ্যামল সবুজ পৃথিবীর সৌন্দর্য হারিয়ে বিবর্ণরূপ ধারণ করবে তার পূর্বাভাস কিছুটা হলেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমনকি প্রয়োজনীয় খাদ্যাভাবে মানব জাতিসহ সকল প্রাণীকুল কিছুটা বিলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা অনেক বেশি হতে পারে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কৃষিতে বেশ কিছু লক্ষণ কৃষি উৎপাদন হ্রাস, মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস, হিউমাস হ্রাস, মৃত্তিকা স্তরের ক্ষয়, অজ্ঞাত রোগ বালাই, অনাবৃষ্টি, খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা, অকাল বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততাবৃদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যাচ্ছে এবং এ সকল সমস্যার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে সরাসরিভাবে কৃষিকাজে; ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষক সম্প্রদায়।

জলাবায়ুর পরিবর্তন ও এর নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। অথচ উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্ষতিকর উপাদানগুলো যেমন কার্বন নির্গমণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ সবচেয়ে কম অপরপক্ষে তথাকথিত উন্নত, ক্ষমতাধর দেশগুলো

বিশ্ব উষ্ণায়নে কার্বন নির্গমণ সহ নানাবিধ ক্ষতিকর উপাদান প্রচুর পরিমাণে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে সবুজ পৃথিবীটাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তাদের প্রতিকারমূলক কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ ধীর গতিসম্পন্ন। অর্থাৎ বায়ূমণ্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সমাধানযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ, অনাগ্রহ ও কালক্ষেপণ উন্নত দেশগুলোর সভ্য মানুষের হীনমন্যতা ও বিবেকহীনতার পরিচয় বহন করে।

প্রতি বছরই উন্নত দেশগুলোর কোন গুরুত্বপূর্ণ শহরে বিশ্বের "জলবায়ু পরিবর্তন ও তার ক্ষতিকর প্রভাব" বিষয়ে নানা ধরনের সমাধান ও পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বিস্তারিত ভাবে বলা হলেও আসলে কার্যকরী ফলাফল পাওয়া যায় খুবই অল্প। ফলে দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর কোন কল্যাণ ও শুভ ফলাফলতো দেখা যায় না বরং তাদের কৃষিক্ষেত্রে বছরের পর উৎপাদন মাত্রা হ্রাস পাচ্ছে এমন কি কোন কোন দেশের কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে সংকটাপন্ন রূপধারণ করেছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চয়তার দিকে ধাবমান। এভাবে চলতে থাকলে খাদ্যাভাবে চরম দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিশ্বের শক্তিধর ও উন্নত দেশগুলোকে প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে ও দ্রুত সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে বাঁচানোর দায়িত্বকে অতীব জরুরি ঘোষণা দেওয়া উচিৎ। অন্যথায় অচিরে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়ে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়টি হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন; দেশে বিদেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ নিয়ে গবেষণা অনেক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। পৃথিবীর সকল দেশ ও মানুষ এখন জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। এর পেছনে রয়েছে গ্রিন হাউস গ্যাস ও গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া; যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঘটিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো জটিল ও মারাত্মক ক্ষতিকর প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং এর নানাবিধ ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম; পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষগুলোকে আতংকিত করে আসছে। জার্মানির একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান জার্মান ওয়াটের তত্ত্বাবধানে তাদের গবেষণা প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয় "জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে

গত ২০ বছরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশ। এর পর ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় শীর্ষে আরো আছে হাণ্ডুরাস, নিকারাগুয়া, হাইতি, ভিয়েতনাম, ডমিনিকান এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থা আশংকা জনক এই জন্য যে, এখানে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস ও সাইক্লোনের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি; তাই জীবন ও জীবিকার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি। গ্রিন হাউস গ্যাস উদগিরণের কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠ উষ্ণায়নের ফলে ধীরে ধীরে মেরু অঞ্চলের হিমবাহ বা বৃহৎ বরফখণ্ড গলে যাচ্ছে; এ বরফগলা পানি পতিত হচ্ছে সাগরে মহাসাগরে-তাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে পানির উচ্চতা, ফলে পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল। বাংলাদেশ হিমালয়ের নিকটবর্তী পাদদেশীয় সমভূমি, বরফগলা পানি বঙ্গোপসাগরে সঞ্চিত হচ্ছে, এতে উপকূলীয় অঞ্চল কক্সবাজার, নোয়াখালী, বরগুণা, খুলনা, পটুয়াখালী নামক অঞ্চল প্লাবিত হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি রয়েছে। তাছাড়া সাগরের অতিমাত্রার লবণাক্ত পানি কৃষিজমিতে, ফসলের জমিতে প্রবেশ করে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফসল ও জনজীবন। বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য উপকূলীয় দেশসমূহ যেমন মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া ও নেদারল্যাণ্ড এখন এরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন; তবে এ সকল দেশে ক্ষতির আশংকা বাংলাদেশের চেয়ে এখন অনেক কম।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নে হিমবাহের গলন, সমুদ্রের পানির আয়তন বৃদ্ধি এবং পানি জমে সমুদ্রের তলদেশের ভরাট- এই ত্রিমুখী প্রতিক্রিয়ায় সমুদ্র তীরের উচ্চতা বৃদ্ধি ঘটেছে। বিশ্ব ব্যাংকের ২০০১ সনের প্রতিবেদন অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরের উচ্চতা বছরে ৩ মিলিমিটার হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের ১ মিটার উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের মোট আয়তনের ১৫.৮ শতাংশ; এতে ২২৮৮৯ বর্গ কিঃমিঃ কৃষি জমি হারিয়ে যাবে; ধানের উৎপাদন হ্রাস পাবে প্রায় ৩০ শতাংশ। বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট 'সুন্দরবনের' অধিকাংশ এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যাবে। ঘন ঘন বন্যায় বিনষ্ট হবে উপকূলীয় গাছপালা, কৃষিজ ফসল, প্রাণীকূল ও স্বাদু পানির প্রাপ্যতা। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ঝড়, বন্যা, জোয়ার ও জলোচ্ছাসে লবনাক্ত পানি ঢুকে পড়বে মূল ভূমির অভ্যন্তরে; এতে মাটির গুণাগুণের অবনমনসহ ফসলধারা ও জীববৈচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে।

কৃষি উপৎপাদনের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্বব্যাপী হলেও বাংলাদেশের ওপর এর প্রভাব লক্ষণীয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রার অসঙ্গতি এবং বৃষ্টিপাত বিন্যাসে স্বাভাবিক অবস্থার বিচ্যুতি ও তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে; ইতোমধ্যেই মৌসুমওয়ারি তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে ফসল উৎপাদন মাত্রা ও ধারার পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও শীতের স্থায়িত্বকাল কমে যাওয়াতে গমের আবাদের পরিমাণ ১৯৯৮-৯৯ সনে ৮.৮২ লক্ষ হেক্টর থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০৭-০৮ সনে এসে দাঁড়িয়েছে ৩.৭০ লক্ষ হেক্টর। অপরদিকে অধিকতর তাপমাত্রা সহনশীল ফসল ভুট্টার আবাদ একই সময়ে ০.১৮ লক্ষ হেক্টর থেকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৮২ লাখ হেক্টরে এসে পৌঁছেছে। সময় মতো বৃষ্টি না হওয়ার কারণে ঘন ঘন খরা বিরাজ করার ইঙ্গিত স্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর খারিফ মৌসুমে প্রায় ২৩ লাখ হেক্টর রোপা আমন এবং রবি মৌসুমে প্রায় ১২ লাখ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার খরার মুখোমুখি হতে দেখা যায়। খরার কারণে বোনা আউশ ধানে শতকরা ৪০ ভাগ; আমন ও অন্যান্য রবি ফসলে অবস্থা ভেদে শতকরা ১৫-৬০ ভাগ ফলন কমে যাওয়ার আশংকা থাকে। খরার প্রভাবে ফসলহানি ছাড়াও মৃত্তিকার অবনমন (Soil degradation) পর খাদ্য সংকট, কর্মসংস্থান হ্রাস, মানব স্বাস্থের ঘাটতি, পুষ্টির অভাব, নানাবিধ জটিল রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। কৃষিজ উৎপাদন হ্রাসের কারণে পাশাপাশি কর্মসংস্থানের অভাবে দৈনন্দিন জীবনে পারিবারিক খাদ্য-গ্রহণ হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা দেখা যাবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক গবেষণা প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানা যায়, "এ দেশের ৫০ শতাংশ পরিবার বছরে কোন কোন সময় খাদ্য সংকটে থাকে। ২৫শতাংশ নিয়মিত ভাবে সারা বছর খাদ্য সংকটে থাকে; ১৫% পরিবার সব সময়ই চিন্তিত থাকে পরের বেলা খাবার নিয়ে এবং ৭ শতাংশ মানুষ কখনোই তিনবেলা খেতে পায় না ; এ জন্য প্রয়োজন খাদ্য নিরাপত্তা এবং তা অবশ্যই নিরাপদ খাদ্য দিয়ে হতে হবে।

আগামী ৫০ বছরে ধানের উৎপাদন এক দশমাংশ হ্রাস পাবার আশংকা করছেন বিশেষজ্ঞরা; এভাবে অন্যান্য ফসলের মধ্যে আলুর বিভিন্ন প্রজাতির এক চতুর্থাংশ বিলুপ্ত হতে পারে; এছাড়া প্রায় ২০ শতাংশের বেশি মাছের প্রজাতির অস্তিত্ব ও হুমকির মুখে পড়বে। বিশ্ব জলবায়ু সংক্রান্ত ঝুঁকি ২০০৬ এর মূল্যায়ন যে ১০টি দেশকে সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে ২য় স্থানে অবস্থানকৃত বাংলাদেশ এবং ১ম স্থানে রয়েছে হণ্ডুরাস। পরিবেশ ও পানি বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাতের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষণগুলো প্রধানত বর্ষায় বৃষ্টিপাত কম হওয়া, সঠিক সময়ে বৃষ্টিপাত না হওয়া, সঠিক সময়ে শীত শুরু না হওয়া, শীতের প্রকোপ কমে যাওয়া, দিনের দৈর্ঘ্য কম হওয়া, প্রতিবছর তাপমাত্রা অল্প করে বৃদ্ধি পাওয়া, আগাম পানি আসা, পানির চাপ বৃদ্ধি হওয়া এবং এগুলো কোন না কোনোভাবে বাংলাদেশের কৃষিকাজ ও জনজীবনকে বিপর্যস্ত করছে।

পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. জহুরুল হক বলেছেন, তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশে গম উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আলু ও শীতকালীন ফসলের ফলনে বিপর্যয় নেমে আসবে। আগামী ২০৩০ সাল হাল নাগাদ বাংলাদেশের জলবায়ুর অবস্থা দাঁড়াবে গরমকালে তাপমাত্রা ০.৭ ডিগ্রি সে. বেড়ে যাবে, শীতকালে ১.৩ ডিগ্রি সে. কমে যাবে, গরমকালে বৃষ্টিপাত বাড়বে শতকরা ১১ ভাগ কিন্তু শীতকালে কমবে শতকরা ৩ ভাগ। গরমকালে বাষ্পীভবন বাড়বে শতকরা ১৫.৮ ভাগ শীতকালে বাড়বে শতকরা ০.৯ ভাগ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দেশে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে; কোন কোন ক্ষেত্রে জমি উর্বরা শক্তি হারাচ্ছে এবং হুমকির মুখে পড়ছে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. নুর-ই-ইলাহি বলেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে; ধান গাছে রোগ ও পোকার আক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে; কৃষকেরা আবহাওয়াকে বুঝতে পারছে না এবং সে অনুসারে সঠিক কাজটি করতে পারছে না।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে অকালে বৃষ্টিপাত বেড়ে যাচ্ছে; বর্তমান শতাব্দীতে বাংলাদেশে বন্যার পরিমাণ ৪০ শতাংশ বেড়ে যেতে পারে; এ ধরনের

প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের দেশ ও অন্যান্য দেশে ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে, যার অনেকগুলো লক্ষণ ইতিমধ্যেই এদেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। পরিবর্তিত জলবায়ুতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে, নিরাপদ ফসল ও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে বেশকিছু জরুরি পদক্ষেপ বা করণীয় প্রস্তাব হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, অধিক তাপমাত্রা সহনশীল জাতের ফসল ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, তেলবীজ, বপন বা চাষাবাদ, আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি, গুটি ইউরিয়া, এলসিসি ব্যবহার, সুষম সার, জৈব সার, খাল পুনঃখনন, সেচ নালার সংস্কার, বৃক্ষরোপণ, বৃষ্টির পানি আহরণের জলধার নির্মাণ, কমিউনিটি পর্যায়ে সোস্যাল অ্যাপ তৈরি করে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, বিভিন্ন সুবিধাভোগী কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণ প্রদান, সম্মিলিতভাবে কৃষিকাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি।

এ সকল অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়নে সরকার, দেশের সকল স্তরের নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা, কর্মচারী ও আপামর জনগোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলোকে অনেকটাই প্রতিহত করা বা সহনীয় পর্যায়ে রেখে কৃষিজ উৎপাদন মাত্রা অব্যাহত রাখা সম্ভব এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অনেকাংশে নিশ্চিত হবে বলে ধরা যেতে পারে।

জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবুর
সহকারী অধ্যাপক, ভুগোল
ভালুম আতাউর রহমান খান কলেজ
কালামপুর ধামরাই, ঢাকা।